বৈকুণ্ঠের উইল

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



বৈকুণ্ঠের উইল

এক

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদারের মুদীর দোকান যখন অনেক প্রকার ঝড়ঝাপটা সহ্য করিয়াও টিকিয়া গেল, তখন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ, কি করিয়া যে বৈকুণ্ঠ তাল সামলাইল তাহা কেহই জানে না। সেই অবধি দোকানখানি ধীরে ধীরে উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছিল।

আবার তেমন দুঃখ-কষ্ট আর যখন রহিল না, অথচ বৈকুণ্ঠ তাহার বড়ছেলে গোকুলকে ইস্কুল ছাড়াইয়া নিজের দোকানে ভর্তি করিয়া দিল, তখনও পাড়ার পাঁচজন কম আশ্চর্য বোধ করিল না। তাহারা বৈকুণ্ঠের আচরণ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিল, দেখলে বুড়োর ব্যবহার! না হয় ছেলেটির তেমন ধার নাই—এক বছর না হয় কেলাসে উঠিতেই পারে নাই, তাই বলে এই কাজ! ওর মা বেঁচে থাকলে কি এরূপ করতে পারত! কৈ ছাড়িয়ে দিক দেখি ওর ছোটছেলে বিনোদকে! ছোটগিন্নী ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে।

বস্তুতঃ গোকুল ছেলেটি মেধাবী ছিল না। ক্লাসে সে কোনদিনই প্রায় ভাল পড়া বলিতে পারিত না। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, সে মুখখানি ম্লান করিয়া তাহার বিমাতার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিমাতা তাহাকে কোলে টানিয়া সস্নেহে মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, গোকুল, বেঁচে থাকতে গেলে এমন কতশত দুঃখ সইতে হয় বাবা! মনের কষ্ট যে ছেলে হাসিমুখে সহ্য করে আবার চেষ্টা করে, সে-ই ত ছেলের মত ছেলে। কেঁদ না বাবা, আবার মন দিয়ে পড়, আসচে বছর পাশ হবে।

ছোটছেলে বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে বাড়ি আসিল। সে দাদার চেয়ে বছর-ছয়েক ছোট, তিন-চার ক্লাস নীচেও পড়ে; কিন্তু সে একেবারে প্রথম হইয়া

ডবল প্রমোশন পাইয়াছে! পুত্রের সুসংবাদ শুনিয়া মা তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন এবং পুলকিত চিত্তে অসংখ্য আশীর্বাদ করিলেন।

সন্ধ্যার পর বৈকুণ্ঠ দোকানের কাজ সারিয়া খাতা বগলে ঘরে আসিয়া উভয় পুত্রের বিবরণ শুনিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। ছেলেদের ভার তাহাদের মায়ের উপর দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। হাত-পা ধুইয়া জল খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ধীরেসুস্থে নিত্যনিয়মিত খাতা দেখিতে বসিয়া গেলেন।

দুই

আমার মা ভবানী কৈ গো? বলিয়া লাঠির গোটা-দুই ঠোকা দিয়া ইস্কুলের ষষ্ঠ শিক্ষক জয়লাল বাঁড়ুয্যে সেইদিন সন্ধ্যাকালেই বৈকুণ্ঠ মজুমদারেব বাড়ির ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের গোলদারি দোকানে চাল-ডাল-ঘি-তেল বাবদে অনেক টাকা বাকী ফেলিয়া গৃহিণীকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন।

ভবানী সন্ধ্যার কাজকর্ম সারিয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ছেলে-দুটিকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়াছিলেন; শশব্যস্তে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উপবেশন করিয়াই শুরু করিয়া দিলেন, হাঁ রত্নগর্ভা বটে মা তুমি! ছেলে পেটে ধরেছিলে বটে! এত ছোকরার মধ্যে তোমার বিনোদ একেবারে ফার্স্ট। একেবারে ডবল প্রমোশন। ওর নম্বর পাওয়া দেখে হেডমাস্টার মশাইয়ের পর্যন্ত তাক লেগে গেছে আজ তাঁকেও গালে হাত দিয়ে দাঁড়াতে হয়েচে! আমিও ত মা, এই ছেলে চরিয়েই বুড়ো হলুম; কিন্তু তোমার এই বিনোদ ছেলেটির মত ছেলে কখনও চোখে দেখলুম না! আমি এই বলে যাচ্ছি আজ ও ছেলে তোমার হাইকোর্টের জজ হবে—হবেই হবে।

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এই গোক্‌লো! কিসে আর কিসে! এ ছোঁড়া এতবড় গাধার সদ্দার মা, এক্‌জামিনের দিন আমিও ত ছিলুম এদের পাহারায়—কত ছেলে টেবিলের নীচে দিব্যি বই খুলে কাপি করে দিলে—ওরই ডাইনে-বাঁয়ে মল্লিকদের দুই ছেলে বই খুলে লিখতে লাগল—আমি দেখেও দেখলুম না—বরং হতভাগাটাকে চোখ টিপে একটা ইশারা পর্যন্ত করে দিলুম, কিন্তু সেই যে বোদা বলদের মত হাত গুটিয়ে বসে রইল, কোনদিকে চোখ পর্যন্ত ফেরালে না নইলে আশু মল্লিকের ছেলে পাশ হয়, আর ও হতে পারে না ! সত্যি কিনা, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ

দেখি মা। বলিয়া জয়লাল মাস্টার লাঠিটা তুলিয়া লইয়া সহসা গোকুলের প্রতি একটা খোঁচানোর ভঙ্গী করিয়াই আপাততঃ কোনমতে তাঁর অস্থি-মজ্জাগত ছেলে-ঠ্যাঙানোর প্রবৃত্তিটা শান্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু গোকুল ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নিমিষের মধ্যে ভবানী দুই বাহু বাড়াইয়া তাঁর এই সপত্নীপুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। গোকুলের মা নাই। মাকে তাহার মনেও পড়ে না। এই বিমাতার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। আজই ইস্কুল হইতে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যখন সে তাঁহার কাছে আসিয়া পড়িল, তখন হইতে আর তাহাকে তিনি কাছছাড়া করেন নাই এবং এতক্ষণে তাঁহাদের চুপি চুপি এই সকল কথাই হইতেছিল। গোকুলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া স্নেহার্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ বাবা, আর সব ছেলেরা বই দেখেছিল, তুমি শুধু কোনদিকে তাকিয়ে দেখও নি?

গোকুল কিছুই বলিতে পারিল না। নিজের অক্ষমতার ইহাও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনে করিয়া সে লজ্জায় একেবারে অধোবদন হইয়া গেল। কিন্তু কথাটা ঘরের মধ্যে বৈকুণ্ঠের কানে যাওয়ায় তিনি হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে কান খাড়া করিয়া রহিলেন।

ভবানী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, এ বছর খুব মন দিয়ে পড়লে আসচে বছর ও-ও ফার্স্ট হতে পারবে।

বিমাতার এই স্নেহের কণ্ঠস্বর বাঁড়ুয্যেমশাই চিনিতে পারিলেন না। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ তাঁহার কাছে এমনি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে কোথাও কোন ক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, সে কথাও তাঁহার মনে উদয় হইল না। ইহাকে একটা মৌখিক শিষ্টতামাত্র জ্ঞান করিয়া তিনি গোক্‌লোকে আরও তুচ্ছ করিয়া দেখাইবার অভিপ্রায়ে জিহ্বার দ্বারা তালুতে একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করিয়া বলিলেন, হায় হায়! গোক্‌লো হবে ফার্স্ট। পূবের সূয্যি উঠবে পশ্চিমে। যে ফার্স্ট হবে মা সে ঐ তোমার বাঁ-দিকে শুনচে। বলিয়া তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিনোদকে নির্দেশ করিয়া হঠাৎ একটুখানি কাষ্ঠহাসির রসান দিয়া

বলিলেন, তাই কি ছোঁড়ার লজ্জাশরম আছে! উলটে ছেলেদের সঙ্গে কোঁদল করছিল যে ‘আমি পাশ হইনি বটে, কিন্তু আমার ছোটভাই যে সক্কলের প্রথম হয়েচে! তোদের কটা ভাই এমন ডবল প্রমোশন পেয়েচে বল্ ত রে!’ শোন একবার কথা মা! ছোটভাই ফার্স্ট হয়েছে—কোথায় ও লজ্জায় মরে যাবে, না, ওর দেমাক দেখ!

ভবানী আর থাকিতে পারিলেন না, জোর করিয়া গোকুলকে টানিয়া লইয়া তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। গোকুল লজ্জায় মরিয়া গিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গোকুল তাহার ছোটভাইটিকে যে কত ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই আরও গুটিকয়েক বাছা বাছা কথা বলিয়া তাঁহার বিনোদকে এই সময় হইতেই যে বাটীতে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পড়ান উচিত, ইহাই জানাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এইসময়ে পাশের ঘরের এক ঝলক আলো মাতা-পুত্রের গায়ের উপর আসিয়া পড়ায় তাঁহার মনে যেন একটু খটকা বাজিল। ভবানী যেমন করিয়া এই নির্বোধ সপত্নীপুত্রকে বুকে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, তাহা ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনটি নয় বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। সুতরাং এই তুলনামূলক সমালোচনা সম্প্রতি আর অধিক ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা, তাহা ঠিক ঠাহর করিতে না পারায় তাঁহাকে অন্য কথা পাড়িতে হইল।

ভবানী এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই শুনিতেছিলেন। এখনও বেশি কথা কহিলেন না। অবশেষে রাত্রি হইতেছে বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই বহুপ্রকার আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়া এবং ভবিষ্যতে বিনোদের জজিয়তি-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বারংবার নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিয়া লাঠিটি হাতে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া বৈকুণ্ঠ ঠিক যেন এই সময়টির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখে

আসিয়া কঠোরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে গোক্‌লো, সবাই বই দেখে লিখে পাশ করে গেল, তুই লিখলি না কেন?

গোকুল ভয়ে কাঁটা হইয়া পূর্ববৎ লুকাইয়া রহিল। অনেক ধমক-টমকের পর সে যাহা কহিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, পূর্বাহ্ণেই হেডমাস্টার মহাশয় আসিয়া চুরি করিয়া দেখাদেখি করিয়া লিখিতে নিষেধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, কাল থেকে আর তোকে ইস্কুলে যেতে হবে না, আমার সঙ্গে দোকানে যাবি। বলিয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজে মন দিলেন। ইহা একটা মামুলি শাসনমাত্র মনে করিয়া ভবানী তখন কথা কহিলেন না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা বৈকুণ্ঠ যখন সত্য সত্যই গোকুলকে দোকানে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন তিনি আগুন হইয়া উঠিয়া ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, যে কথা নয়, সেই কথা! দুধের ছেলে যাবে তোমার দোকান করতে? সে হবে না—আমি বেঁচে থাকতে আমার গোকুলকে পড়া ছাড়াতে দেব না। এমন রাগ ত দেখিনি! বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে ছেলেকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, বৈকুণ্ঠ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, কে রাগ করেছে ছোটবৌ?

গৃহিণী কহিলেন, তুমি। আবার কে?

আমাকে রাগ করতে কখনও দেখেছ?

এ তবে তোমার কি-রকম কথা শুনি? ছেলেবেলা পাশ-ফেল সবাই হয়। তাই বলে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবে?

বৈকুণ্ঠ তখন গোকুলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, ছোটবৌ, রাগ আমি করিনি। তোমার বড়ছেলেকে আজ বড় আহ্লাদ করেই আমি দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। ছোটছেলে তোমার কখনও জজিয়তি পাবে কিনা, বাঁড়ুয্যেমশায়ের মত সে ভরসা তোমাকে দিতে পারলুম না; কিন্তু আমার

অবর্তমানে গোকুলের ওপর যে তোমরা নির্ভয়ে ভর দিতে পারবে, সে আমি তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্চি।

স্বামীর অবিদ্যমানতার কথায় ভবানীর চোখের কোণ একমুহূর্তেই আর্দ্র হইয়া উঠিল। বলিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু গোকুল যে বড্ড সোজা মানুষ—ও কি তোমার ব্যবসার ঘোরপ্যাঁচই বুঝতে পারবে? ওকে হয়ত সবাই ঠকিয়ে নেবে।

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া কহিলেন, সবাই ঠকাবে না। তবে কেউ কেউ ঠকিয়ে নেবে, সে কথা সত্যি। তা নিক, কিন্তু ও ত কারুকে ঠকাবে না? তা হলেই হবে। মা-লক্ষ্মী ওর হাতে আপনি এসে ধরা দেবেন। বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠর নিজের চোখও সজল হইয়া উঠিল। তিনি নিজেও খাঁটি লোক, কিন্তু মূলধনের অভাবে অনেকদিন অনেক কষ্টই ভোগ করিয়াছেন। এখন যদি বা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু সময়ও ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে শক্তি-সামর্থ্যও আর নাই। তাড়াতাড়ি চোখের উপর হাতটা বুলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, গিন্নী, এই বয়সে গোকুল যত বড় লোভ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেচে, সে যে কত শক্ত, তা তুমি হয়ত বুঝতে পারবে না। যে এ পারে, তার ত ব্যবসার ঘোরপ্যাঁচ চৌদ্দ আনা শেখা হয়ে গেছে। শুধু বাকী দুটো আনা আমি তাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

কিন্তু লোকে কি বলবে?

লোকের কথা ত জানিনে ছোটবৌ। আমি শুধু আমাদের কথাই জানি। আমি জানি, ওর হাতে তোমাদের সঁপে দিয়ে আমি নির্ভয়ে দু'চক্ষু বুজতে পারব।

ভবানী নিজেও কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাঁর শেষ কথায় একটা আসন্ন বিপদের বার্তা অনুভব করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা নিয়ে যাও। বলিয়া নিজে গিয়া গোকুলকে ডাকিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিলেন। তাহার মুখচুম্বন

করিয়া বলিলেন, ওঁর সঙ্গে দোকানে যাও বাবা! তুমি মানুষ হলেই তবে আমরা দাঁড়াতে পারব।

গোকুল পিতামাতার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে বেচারা কাল রাত্রেই বিছানায় শুইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ বৎসর যেমন করিয়া হোক উত্তীর্ণ হইবেই। ইস্কুল ছাড়িয়া দোকান যাইতে কোন ছেলেই গৌরব বোধ করে না; কিন্তু কোনদিনই সে মায়ের অবাধ্য নহে। সহপাঠীদের বিদ্রূপের খোঁচা তাহার মনে বাজিতে লাগিল, কিন্তু সে কোন আপত্তি করিল না, নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিল।

তিন

দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, জরাগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ নিজেও মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু গোকুলের সম্বন্ধে সে ভুল করে নাই, তাহা তাহার বাড়িটার পানে চাহিলেই বুঝা যায়। গঞ্জের ভিতর সে মুদীর দোকান আর নাই। তাহার পরিবর্তে প্রকাণ্ড গোলদারি দোকান। সেখানে লাখো টাকার কারবার চলিতেছে। বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া এম. এ. পড়ে। বৈকুণ্ঠ নাতি-নাতনীর মুখ দেখিয়া পরম সুখে মরিতে পারিত, কিন্তু কিছুদিন হইতে ছোটছেলের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসিত জনশ্রুতিতে তাহার অবশিষ্ট দিনগুলো বড় ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন সকালে বৈকুণ্ঠ জীবনের শেষ ডাক শুনিতে পাইলেন। সর্বাঙ্গে কি একপ্রকার নূতন অস্বস্তি লইয়া জাগিয়া উঠিয়া গৃহিণীকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ছোটবৌ, আমার ত সময় হয়েছে, তাই একটু এগিয়ে চললুম। তোমার যতদিন না আসা হয় ততদিন আমার ছেলে দু'টিকে দেখো। তোমার হাতেই তাদের দিয়ে গেলুম।

স্বামীর শীর্ণ হাতখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া ভবানী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, গোকুলকে রেখে তার মা মারা গেলে—আমার কিছুতেই আর দ্বিতীয় সংসার করবার ইচ্ছা ছিল না। আমি কোন মতেই বিয়ে করতুম না; কিন্তু যখন দেখলুম আমি একা, গোকুলকেই হয়ত বাঁচাতে পারব না, তখনই শুধু বড় কষ্টে, বড় ভয়ে ভয়ে রাজি হয়েছিলুম। ভগবান আমার মনের কথা জানতে পেরেছিলেন; তাই এমন স্ত্রী দিলেন যে, কোনোদিন কোন দুঃখ পাইনি। শুধু বিনোদ যদি আমার শেষকালটায় এত দুঃখ না দিত, তা হলে কত সুখেই না আজ যেতে পারতুম। বলিতে বলিতেই তাঁহার ম্লান চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া

উঠিল। ভবানী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, আমি মরতেও পারচি নে ছোটবৌ, আমার অবর্তমানে আমার এত কষ্টের দোকানটি বিনোদ হাতে পেয়ে দু'দিনে নষ্ট করে ফেলবে। এ শোক আমি পরকালে বসেও সহ্য করতে পারব না—সেখানেও আমার বুকে শেল বাজবে।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুধু কি তাই? তোমার দাঁড়াবার স্থান থাকবে না—আমার গোকুলকেও হয়ত ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে, বলিতে বলিতেই বৈকুণ্ঠ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। এরূপ দুর্ঘটনার কল্পনামাত্রেই তাঁহার বক্ষস্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভবানী তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখের উপর মুখ আনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ওগো, বিনোদকে তুমি কিছুই দিয়ে যেও না।

তোমার গায়ের রক্ত-জল-করা জিনিস আমি কারুকে দেব না। দোকান, ঘর, বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তুমি গোকুলকে লিখে দিয়ে যাও। তুমি শান্ত হও—নিশ্চিন্ত হও—আমি নিজে তার সাক্ষী হয়ে থাকব।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেবল এই কথাই আমি দিবারাত্রি ভাবচি ছোটবৌ, আমি ভগবানকে পর্যন্ত মন দিয়ে ডাকতে পারচি নে! কিন্তু তুমি কি এতে মত দিতে পারবে? বলিয়া বৈকুণ্ঠ হতাশভাবে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল। তিনি মরণোন্মুখ স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুজড়িত-কণ্ঠে কহিলেন, ওগো, আমি মত দিতে পারব। তোমাকে ছুঁয়ে বলচি পারব। আমি আর কিছুই চাইনে, শুধু চাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও—সুস্থ হও। এ সময়ে তোমার মনে যেন কোন ক্ষোভ, কোন ক্লেশ না থাকতে পায়।

বৈকুণ্ঠ আবার কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু বিনোদ?

ভবানী নিমিষমাত্র দেরি না করিয়া কহিলেন, তার কথা তুমি ভেবো না। সে লেখাপড়া শিখচে—নিজের পথ সে নিজে করে নেবে। আর যত মন্দই হোক—গোকুল তাকে ফেলতে পারবে না—ছোটভাইকে সে দেখবেই।

বৈকুণ্ঠ আর কথা কহিলেন না। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভবানী সেইখানে একভাবে পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন, নিদারুণ অভিমানে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার গর্ভের সন্তানকে স্বামী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মন্দ বলিয়া মৃত্যুকালে পুত্রের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন, এ দুঃখ তাঁহার বক্ষে যে কি শূলবিদ্ধ করিল, তাহা তিনি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। সে মন্দ হোক, যা হোক, তিনি ত মা? সে ত তাঁহারই সন্তান? সেই দুর্ভাগ্য সন্তানের অন্ধকার-ভবিষ্যৎ চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় এইবার মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু পিছাইয়া পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় কোনদিকে চাহিয়া চোখে পড়িল না। মুমূর্ষু স্বামীর তৃপ্তির জন্য সন্তানের সর্বনাশের পথ যখন নিজেই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন কে তাঁহার মুখ চাহিয়া সে পথ যাচিয়া রুদ্ধ করিয়া দিতে আসিবে?

সেইদিনই অপরাহ্নকালে উকিল ডাকিয়া রীতিমত উইল লেখা হইয়া গেল। বৈকুণ্ঠ স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার বড়ছেলেকে লিখিয়া দিলেন। সাক্ষী হইয়া নাম লিখিতে গিয়া ভবানীর হাত কাঁপিয়া গেল। মাতৃস্নেহ কোথায় অলক্ষ্যে বসিয়া বারংবার তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতে লাগিল, কিন্তু নিবৃত্ত করিতে পারিল না।

স্বামীর পা দুইখানি অন্তরের মধ্যে দৃঢ়-স্থাপিত করিয়া তিনি আঁকাবাঁকা অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিলেন। বিনোদ কোন কথাই জানিল না। সে তখন কলিকাতার এক অপবিত্র পল্লীতে, ততোধিক অপবিত্র সংসর্গে মদ খাইয়া মাতাল হইয়া রহিল। বাটী হইতে যে দুইজন কর্মচারী তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহারা দুইদিন পর্যন্ত তাহার বাসায় বৃথা অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। কেহই এ সংবাদ বৈকুণ্ঠকে দিতে সাহস করিল না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু কিছুই তাঁহার কাছে চাপা রহিল না।

আরও দিন-দুই টালে-বেটালে কাটিয়া আজ সকাল হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। সমস্তদিন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি চোখ মেলিলেন। ভবানী শিয়রের কাছে বসিয়াছিলেন, গোকুল পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছিল। বৈকুণ্ঠ ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, বিনোদ বুঝি খবর পেলে না গোকুল? নইলে সে নিশ্চয় আসত। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণ বাহিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এই কয়দিনের মধ্যে তিনি বিনোদের নাম একটিবারও মুখে আনেন নাই। সহসা শেষ সময়ে ছেলের নাম স্বামীর মুখে শুনিয়া ধিক্কারে বেদনায় ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু তিনি তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

গোকুল পিতার চোখ মুছাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, চোখে তাকে দেখতে পেলুম না, কিন্তু তাকে বলিস আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, একদিন সে ভাল হবে। এমন মায়ের পেটে জন্মে কখনো এভাবে চিরকাল কাটাতে পারবে না। দেখিস বাবা, সেদিন তোর ছোটভাইকে যেন ফেলিস নে। আর এই তোমার মা রইলেন—অনেক তপস্যায় তবে এমন মা মেলে গোকুল!

গোকুল শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, বাবা, আমার মা আমারই রইলেন, কিন্তু বিনোদকে আপনি অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে যান।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, না গোকুল, আমার অনেক দুঃখের সম্পত্তি—এ নষ্ট হতে দেখলে পরকালে বসেও আমার বুকে শেল বাজবে। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। বলিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছেলের মুখের পানে চাহিয়া, বোধ করি বা মনে মনে তাঁহার শেষ আশীর্বাদ করিয়া চোখ বুজিলেন। গোকুল পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া শুধু চুপি চুপি বলিলেন, ছেলেরা রইল ছোটবৌ, আমি এবার চললুম।

আর কথা কহিলেন না। এবং পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন অনেকেই অনেক কথা কহিল। বৈকুণ্ঠ পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। বিশেষতঃ অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে বড় হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শত্রুমিত্র দু-ই তাঁর একটু বেশি পরিমাণে ছিল। মিত্রপক্ষের গুণগান অত্যুক্তিকে ছাড়াইয়া গেল। আবার শত্রুপক্ষেরা নিন্দা করিতেও ত্রুটি করিল না। তাহারা কৃপণ বলিয়া, চশমখোর বলিয়া, বৈকুণ্ঠ মুদীর স্ফীত অঙ্গুলির সহিত কদলী-কাণ্ডের উপমা দিয়া বোধ করি বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। তবে এই একটা অতি তুচ্ছ গুণের কথা তাহারাও অস্বীকার করিল না যে, আর যাই হোক লোকটা জোচ্চোর বাটপাড় ছিল না। নিজের ন্যায্য পাওনার বেশী কাহাকেও কোনদিন একটি তামার পয়সাও ফাঁকি দেয় নাই। বস্তুতঃ ব্যবসা সম্বন্ধে এই বিদ্যাটিই তিনি বিশেষ করিয়া তাঁর বড়ছেলেকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ বার বার বলিতেন, গোকুল, আমার এই কথাটি কোনদিন ভুলিস নে বাবা যে, ঠকিয়ে কখনো মহাজনকে মারা যায় না। তাতে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই মরতে হয়।

নিজের পলিত মস্তকটি দেখাইয়া বলিতেন, এই মাথাটার উপর দিয়ে অনেক ঝড়বৃষ্টি বয়ে গেছে গোকুল, অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েচি, কিন্তু এর জোরে

কখনো কারো কাছে মাথা হেঁট করিনি। আমার এই মর্যাদাটুকু বজায় রাখিস বাবা!

চার

বিনোদ বিষয় পায় নাই, কথাটা প্রকাশ পাইবামাত্র পাড়ার দুই-চারিজন গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় গিয়া খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়া দিল। তখন আর কোন কথাই চাপা রহিল না। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বিনোদের ব্যাপার নাম-ধাম পরিচয় দিয়া একেবারে প্রকাশ করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অকৃতজ্ঞ গোকুল তাহাদের এই উপকার স্বীকার করিল না। সে রাগের মাথায় একেবারে ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, শালারা সব মিথ্যেবাদী। কেবল হিংসা করে এই সব রটাচ্চে।

অতিবৃদ্ধ বাঁড়ুয্যেমশাই লাঠি ঠকঠক করিয়া আসিয়াই একেবারে কাঁদিতে শুরু করিয়া দিলেন। অনেক কষ্টে কান্না থামিলে বলিলেন, গোকুল রে, আমার হারাণ তিনদিন তিনরাত্রি খায়নি শোয়নি, কেবল কলকাতার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েচে। পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ করে তবে সন্ধান পেয়েচে, কোথায় সে ছোঁড়া থাকে। এ ঠিকানা বার করা আর কি কারো সাধ্য ছিল?

গোকুল তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি ত কাউকে টাকা খরচ করতে সাধিনি মশাই!

বাঁড়ুয্যে অবাক হইয়া কহিলেন, সে কি গোকুল, আমরা যে তোমাদের আপনার লোক! আর সবাই চুপ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পারি কৈ?

আচ্ছা, যান যান, আপনারা কাজে যান। বলিয়া গোকুল নিতান্ত অভদ্রভাবে অন্যত্র চলিয়া গেল। একদিন দুইদিন করিয়া কাটিতে লাগিল, অথচ বিনোদ আসে না। শান্তপ্রকৃতি গোকুল একেবারে উগ্র হইয়া উঠিল।

ভবানীকে দেখিলে যেন চেনা যায় না, এই কয়দিনে তাঁহার এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নীরবে নতমুখে আগামী শ্রাদ্ধের কাজকর্ম করেন—ছেলের নাম মুখেও আনেন না।

এই একটা বৎসর বিনোদ যখন-তখন নানা ছলে গোকুলের নিকট টাকা আদায় করিত। তাহার স্ত্রী মনোরমা ব্যাপারটা পূর্বেই অনুমান করিয়া স্বামীকে বারংবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সে কান দেয় নাই। এই উল্লেখ আজ সকালে করিবামাত্রই গোকুল আগুন হইয়া কহিল, বিনোদ যখন কারুর বাপের বাড়ির টাকা নষ্ট করবে, তখন যেন তারা কথা কয়। বলিয়া দ্রুতপদে তাহার বিমাতার ঘরের সুমুখে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, অতবড় রাবণ রাজা মেয়েমানুষের পরামর্শে সবংশে ধ্বংস হয়ে গেল, তা আমরা কোন্ ছার! কি যে বাবার কানে কানে ফুস্ ফুস্ করে উইল করার মন্তর দিলে মা, সবদিকে আমাকে মাটি করে দিলে।

ভবানী আশ্চর্য হইয়া মুখ তুলিবামাত্রই সে হাত-পা নাড়িয়া একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া ফেলিল, তোমাকে ভালমানুষ বলেই জানতুম মা, তুমিও কম নয়!

মেয়েমানুষের জাতটাই এম্‌নি! বলিয়া, তাঁহাকে ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। একে দোকানদার তাহাতে মূর্খ, গোকুলের কথাই এমনি সকলেই জানিত। বিশেষতঃ রাগিলে আর তাহার মুখে বাধা-বাঁধন থাকিত না। ইহাও কাহারো অগোচর ছিল না। কিন্তু তাহার আজকালকার কথাবার্তাগুলো বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছে বলিয়া আত্মীয়-পর সকলেরই মনে হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণবেলায় বাঁড়ুয্যেমশাই দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতেছিল—হঠাৎ গোকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অপমান করিলেও ত সে বড়লোক। সুতরাং তাহার আগমনে বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। গোকুল

তিনখানি নোট ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া ম্লানমুখে, বিনীতভাবে বলিল, মাস্টারমশাই, হারাণের সেদিনকার খরচাটা দিতে এলুম।

থাক থাক, সেজন্যে আর ব্যস্ত কেন দাদা, তোমাদের কতই ত খাচ্চি নিচ্চি। বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই সে নোট তিনখানি তুলিয়া লইলেন। গোকুলের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয়ের প্রান্তে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কৈ আজও ত বিনোদ এলো না মাস্টারমশাই! হারাণকে সঙ্গে করে আমি একবার আজ যাব।

বাঁড়ুয্যেমশাই তীব্রভাবে সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, এমন কথা মুখেও এনো না ভাই। সে স্থানে যাবে তুমি, আমার হারাণ থাকতে? না না, তা হবে না—আমি কালই তাকে পাঠিয়ে দেব।

গোকুল মাথা নাড়িয়া কহিল, না মাস্টারমশাই, আমি না গেলে হবে না। সে বড় অভিমানী—শুধু উইলের কথা শুনেই অভিমানে আসচে না। আমার মুখ থেকে না শুনলে সে আর কারো কথাই বিশ্বাস করবে না। বাপ-মায়ে আমার কি সর্বনাশই করলে! বলিয়া গোকুল সহসা আর্তস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা দিয়া এবং তাহার এ-অবস্থায় কোনমতেই সে স্থানে যাওয়া হইতে পারে না বলিয়া, কালই হারাণের দ্বারা তাহাকে আনাইয়া দিবেন, বার বার প্রতিজ্ঞা করিলেন। গোকুল নিরুপায় হইয়া আর পাঁচখানি নোট হারাণের খরচের বাবদ ধরিয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিয়া গেল।

পাঁচ

জয়লাল মাস্টারকে গোকুল গোপনে আশী টাকা ঘুষ দিয়া আসিয়াছে—কথাটা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অনেকেই তাহার নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। সে বিনোদের জন্য ছটফট করিতেছে, অথচ বিনোদ তাহাকে ভ্রুক্ষেপের দ্বারাও গ্রাহ্য করে না—এমনধারা একটা আভাসও বাড়িসুদ্ধ সকলের চোখে-মুখে অনুভব করিয়া গোকুল মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ির গাড়ি বোধ করি এই লইয়া দশবার চুঁচুড়া স্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল। গোকুল তাচ্ছিল্যভাবে কোচম্যানকে প্রশ্ন করিল, আর কি কলকাতার গাড়ি নেই যে তোরা ফিরে এলি? যা, যা, তোরা জিরো গে যা।

কোচম্যান বিনীতভাবে কহিল, আরো দুখানা আছে বটে, কিন্তু ঘোড়া দানাপানি পায় নাই বলেই চলে আসতে হ'লো।

গোকুল একমিনিটেই সপ্তমে চড়িয়া ধমকাইয়া উঠিল, ছোটবাবু মেঠাই-মণ্ডা খায়কে আসতা হ্যায় কিনা, তাই ব্যাটাদের নবাব ঘোড়া একদণ্ড দানাপানি না পেলেই মরে যাবে! যাও, আভি লে যাও।

কোচম্যান প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

রসিক চক্রবর্তী বহুদিনের কর্মচারী। এ বাটীতে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। সে কহিল, ছোটবাবু এলে গাড়ি ভাড়া করেও আসতে পারবেন। সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন বড়বাবু?

রসিক যে নিকটেই ছিল, গোকুল তাহা দেখে নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমি ব্যস্ত হব সে হতভাগার জন্যে? তুমি বল কি চক্কোত্তিমশাই? বাড়িতে

মেয়েরা অমন দিবারাত্রি কান্নাকাটি না করলে আমি ত তাকে বাড়ি ঢুকতেই দিইনে। গোকুল মজুমদার রাগলে বাপের কুপুত্তুর—হ্যাঁ।

রসিকের কিছুই অবিদিত ছিল না। বাটীর মেয়েরা যে বিনোদের অদর্শনে একটি দিনের জন্যেও চোখের জল ফেলে নাই, তাহা সে জানিত। কিন্তু এ লইয়া আর তর্কও করিল না।

সমারোহ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। গোকুল সেজন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু কান দুটা তাহার গাড়ির চাকার দিকেই পড়িয়া ছিল। ঘণ্টা-দুই পরে সে বহুদূরে একটা ভারী গাড়ির আওয়াজ পাইয়া রসিক চক্রবর্তীকে শুনাইয়া একটা চাকরকে ডাকিয়া কহিল, ওরে এগিয়ে দেখত রে, আমাদের গাড়ি কিনা! ঘোড়া দুটোকে হয়রান করে মারলে বলে রাগ করে দুটো কথা বললুম, আর বেটারা কিনা সত্যি মনে করে গাড়ি নিয়ে ইস্টিসানে ফিরে গেল! গুণধর ভায়ের জন্য আবার গাড়ি পাঠাতে হবে! সৎমার রাগ হবে বলে ত আর ঘোড়া দুটোকে ফেলা যায় না!

রসিক শুনিতে পাইল, কিন্তু ভালোমন্দ কোন কথাই কহিল না। অনতিকাল পরে খালি গাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আস্তাবলে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল। রসিক সম্মুখে ছিল। গোকুল তাহার পানে চাহিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, তবে ত দুঃখে মরে গেলুম। যা, যা, বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে বল গে, তার পাশ-করা ছেলের কীর্তি। কাল-পরশু এলে যদি তাকে ফটক পার হতে দিই ত তখন তোরা বলিস—হাঁ, সে ছেলে গোকুল মজুমদার নয়। একবার যখন বেঁকে বসেছি, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও যদি তার হয়ে বলে, তবুও মুখ পাবে না তা বলে দিচ্ছি। তুমি মাকে বলে দাও গে চক্কোত্তিমশাই, পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে তবু গোকুল মজুমদারের কথার নড়চড় হবে না। সময়ে এলে কিছু পেত; এখন আর একটি পয়সাও না। বাড়ি ঢুকতেই ত তাকে দেব না। বলিয়া গোকুল হনহন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গোকুল কাহার উপরে ক্রোধ করিয়া যে অসময়ে আসিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিল তাহা বাটীর মেয়েরা টের পাইল না। দাসী দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। দোকানের গোমস্তার উপর অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ প্রস্তুতের ভার ছিল। সে ঘরে আসিয়া কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই গোকুল তড়াক করিয়া উঠিয়া কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বাবা দশখানা তালুক রেখে যাননি যে, রাজা-রাজড়ার মত পণ্ডিত-বিদায় করতে হবে! যাও, যাও, ওসব আমিরী চাল আমার কাছে খাটবে না।

লোকটা যারপরনাই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

ভবানী জানিতে পারিয়া ঘরের বাহিরে চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কি কোনরকম অসুখ বোধ হচ্ছে গোকুল?

গোকুল যেমন শুইয়া ছিল, তেমনিভাবে জবাব দিল, না।

ভবানী বলিলেন, না, তবে যে কিছু খেলিনে, হঠাৎ এমন সময়ে এসে যে শুয়ে পড়্লি?

গোকুল কহিল, পড়্লুম।

ভবানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলি যে? কাল সকালেই নিমন্ত্রণপত্র না পাঠালে আর সময় হবে না বাবা।

গোকুল ঠিক তেমনি করিয়া জবাব দিল, না হয় নাই হবে।

ভবানী কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ছি গোকুল, এ সময়ে ও-রকম অধীর হলে ত হবে না। কি হয়েচে আমাকে খুলে বল্—আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

মায়ের কথার উত্তরে গোকুল তাহার কম্বলের শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখ পাকাইয়া উঠিয়া বসিল। কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, সে কোনদিন শিক্ষা করে নাই। কর্কশকণ্ঠে কহিল, তোমার যে মতলব শোনে মা, সে একটা গাধা। বাবা তোমার কথা শুনত বলে কি আমিও শুনব? আমি দশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হব, কোন জাঁকজমক করব না। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভবানী শান্তস্বরে কহিলেন, ছি বাবা, তিনি স্বর্গে গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে কি এমন করে কথা কইতে আছে!

গোকুল জবাব দিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, এ রকম করলে লোকে কি বলবে বল দেখি বাছা! যাদের যেমন সঙ্গতি, তাদের তেমনি কাজ করতে হয়, না করলেই অখ্যাতি রটে।

গোকুল তেমনিভাবে থাকিয়াই কহিল, রটাক গে শালারা। আমি কারো ধার ধারিনি যে ভয়ে মরে যাব।

ভবানী বলিলেন, কিন্তু তাঁর এতে তৃপ্তি হবে কেন? তিনি যে এত বিষয়-আশয় রেখে গেলেন, তাঁর মত কাজ না করলে তিনি সুখী হবেন না।

ভবানী ইচ্ছা করিয়াই গোকুলের বড় ব্যথার স্থানে ঘা দিলেন। পিতাকে সে যে কি ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

গোকুল উঠিয়া বসিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, খরচের কথা কে বলচে মা। যত ইচ্ছে তোমরা খরচ কর; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই যে আমার হাত-পা বন্ধ হয়ে আসচে। বিনোদ অভিমান করে উদাসীন হয়ে গেল মা, আমি একলা কি করে কি করব? বলিয়া সে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভবানী নিজেকেও আর সামলাইতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুজড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এ খবর পেয়েচে গোকুল?

গোকুল তৎক্ষণাৎ কহিল, পেয়েচে বৈ কি মা।

কে তাকে খবর দিল?

কে যে তাহাকে বাড়ির এই দুঃসংবাদ দিয়াছে, গোকুল নিজেও তাহা জানিত না। মাস্টারমশায়ের পুত্র হারাণের সম্বন্ধে তাহার নিজেরও সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া যেন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া বসিয়াছিল—বিনোদ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই শুধু লজ্জা ও অভিমানেই বাড়ি আসিতেছে না। সে মায়ের মুখপানে চাহিয়া কহিল, খবর সে পেয়েচে মা। বাবা চিরকালের মত চলে গেলেন—এ কি সে টের পায়নি? আমার মত তার বুকের ভেতরেও কি হাহা করে আগুন জ্বলে যাচ্ছে না? সে সব জেনেচে মা, সব জেনেচে।

ভবানী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অবশেষে যখন কথা কহিলেন, গোকুল আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিল—মায়ের সেই অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠস্বর আর নাই। কিন্তু তাহাতে উত্তাপও ছিল না। সহজকণ্ঠে বলিলেন, গোকুল, তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তবে অমন ভায়ের জন্যে তুই আর দুঃখ করিস নে। মনে কর, আমাদের বংশে আর ছেলেপিলে নেই। যে রাগের বশে মরা বাপ-মায়ের শেষ-কাজ করতেও বাড়ি আসে না, তার সঙ্গে আমাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।

গোকুল এ অভিযোগের যে কি জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু জবাব দিল তাহার স্ত্রী। সে দ্বারের আড়ালে বসিয়া সমস্ত আলোচনাই শুনিতেছিল। সেইখান হইতেই বেশ স্পষ্ট গলায় কহিল, ঠাকুর কি না বুঝেই এমন একটা কাজ করে গেলেন? তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। তিন-চারদিন ধরে কলকাতার বাসায় ঠাকুরপোকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখনই ত তিনি তাঁর গুণগান সব ধরে ফেললেন। তাঁর বিষয় তিনি যদি সমস্ত দিয়ে যান, তাতে আমাদের কেউ ত আর দোষ দিতে পারবে না। তুমি যাই, তাই ভাই ভাই কর, আর কেউ হলে—

টানটা অসমাপ্তই রহিল। আর কেহ কি করিত তাহা খুলিয়া বলা এ ক্ষেত্রে বড়বৌ বাহূল্য মনে করিল। কিন্তু ভবানী মনে মনে ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কারণ ইতিপূর্বে শ্বশুর বর্তমানে বড়বৌ এরূপ কথা কোনদিন বলে নাই, এমন কি শাশুড়ীর সামনে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথাই কহে নাই। এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উন্নতিতে তিনি নির্বাক হইয়া রহিলেন।

গোকুলও প্রথমটা কেমন-যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার দিকে ডান হাত প্রসারিত করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া একেবারে ক্ষ্যাপার মত চেঁচাইয়া উঠিল, শোন মা শোন। ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।

প্রত্যুত্তরে বড়বৌ চেঁচাইল না বটে, কিন্তু আরও একটুখানি সবল-কণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দ্যাখো, যা বলবে আমাকে বল। খামকা বাপ তুলো না—আমার বাপ তোমার বাপ একই পদার্থ।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু কথা ফুটিল না। কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল।

ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এখন মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, বৌমা, তোমার কথা ক'বার দরকার কি মা! যাও, নিজের কাজে যাও।

বৌমা কহিল, কথা আমি কোনদিনই কইনে মা। দাসী-চাকরের মত খাটতে এসেছি, দিবারাত্রি খেটেই মরি। কিন্তু উনি যে খেতে শুতে বসতে—আমার চারটে পাশ-করা ভাই, আমার পাঁচটা পাশ-করা ভাই করে নাপিয়ে বেড়ান; কিন্তু ভাই ত বাড়ি এসে মুখ্যু বলে একটা কথাও কোনদিন কয় না। ওঁর নিজের লজ্জা-শরম থাকলে কি আর কথা বলবার দরকার হয়? বলিয়া সে তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া গুমগুম পায়ে অবস্থাটা জানাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া আজ এতদিন পরে ভবানী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতদিন তিনি তাঁহার

বড়বধূটিকে চিনিতে পারেন নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাঁহার দুঃখ, ক্ষোভ ও শঙ্কার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

কিন্তু বড়বৌ একেবারে চলিয়া যায় নাই। সে বারান্দায় একপ্রান্ত হইতে—কাহারো শুনিতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় বলিল, যখন-তখন শুধু রাশ রাশ টাকা যোগাবার বেলাতেই দাদা। আমার মামাদেরও দু-পাঁচটা পাশ করে বেরুতে দেখচি ত। কিন্তু সাবধান করে দিতে গেলেই তখন বড় তেতো লাগত। তা বাবু, তেতোই লাগুক আর মিষ্টিই লাগুক, নিজের টাকা অমন করে অপব্যয় হতে থাকলে নিজের ছেলেপিলের মুখ চেয়ে আমি কিছু আর চিরকালটা মুখ বুজে থাকতে পারিনে। মুখ্যু দাদা পেয়েচে, যত পেরেচে, তত ঠকিয়েচে। ঠকাক, আমার কি? ওর নিজের ছেলেমেয়েই পথে বসবে। বলিয়া বড়বৌ সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

গোকুল হাত-পা ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। অনুপস্থিত স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতে লাগিল।

কি! আমি মুখ্যু? কোন্ শালা বলে? এ-সব বিষয়-সম্পত্তি করলে কে? আমি, না বেন্দা? আমার চোখে ধুলো দিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে যাবে—বেন্দার বাপের সাধ্যি আছে? আমি বড়, সে ছোট। সে চারটে পাশ করে থাকে ত আমি দশটা পাশ করতে পারি তা জানিস? আমি মুখ্যু? বাড়ি ঢুকলে দরোয়ান দিয়ে তাকে দূর করে দেব—দেখি, কে তাকে রাখে।

এমনি অসংলগ্ন এবং নিরর্থক কত-কি সে অবিশ্রান্ত চিৎকার করিতে লাগিল! ভবানী সেই যে নীরব হইয়াছিলেন, আর কথা কহিলেন না। বহুক্ষণ পর্যন্ত একভাবে পাথরের মত বসিয়া থাকিয়া একসময়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

ছয়

তখন ঝগড়া হইল বটে, কিন্তু সেই রাত্রেই যে স্ত্রীর সহিত গোকুলের একটা মিটমাট হইতে বাকি রহিল না, সে তাহার পরদিনের ব্যবহারেই বুঝা গেল। হঠাৎ সকাল হইতেই সে সমস্ত কাজকর্মে হাঁকডাক করিয়া লাগিয়া গেল এবং আগামী কর্মের দিনটি আসিয়া পড়িতে যে মাত্র তিনটি দিন বাকি রহিয়াছে, সে কথা বাড়িসুদ্ধ সকলকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া ফিরিতে লাগিল। বাহিরের যে-কেহ বিনোদের নাম উত্থাপন করিলেই, আজ সে কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিল, নিজের বাপ যাকে মৃত্যুকালে ত্যাজ্যপুত্র করে যায়, তার কথা কেউ জিজ্ঞেস করবেন না। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমার যে ভাই ছিল, সে মরে গেছে।

তাহার কথা শুনিয়া কেহ চোখ টিপিয়া আর একজনকে ইঙ্গিত করিল, কেহ অলক্ষ্যে ঘাড় নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করিল। অর্থাৎ এই সোজা কথাটি কাহারো অবিদিত রহিল না যে, বিনোদ একেবারেই পথে বসিয়াছে এবং গোকুল যে-কোন কৌশলেই হোক, ষোল আনাই গ্রাস করিয়াছে। এখন গোপনে অনেকেই বিনোদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, সে আসিয়া এই ভয়ানক জুয়াচুরির বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের নিকট সাহায্য পাইতেও পারিবে—এরূপ আভাসও কেহ কেহ দিতে লাগিল। সুবিজ্ঞ জয়লাল বাঁড়ুয্যে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, মানুষকে যে চিনিতে পারা যায় না, তাহার জীবন্ত প্রমাণ এই গোকুল মজুমদার। শুধু তাঁহার চক্ষেই সে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে পারে নাই। কারণ পাড়ার সমস্ত ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষে যখন একবাক্যে গোকুলকে ন্যায়নিষ্ঠ, ভ্রাতৃবৎসল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছে, তখন তিনিই শুধু চুপ করিয়া হাসিয়াছেন আর মনে মনে

বলিয়াছেন, আরে, সৎমার ছেলে বৈমাত্র ভাই—তার ওপর এত টান! বেদে-পুরাণে যা কস্মিনকালে কখনো ঘটেনি, তাই হবে এই ঘোর কলিকালে! সুতরাং এতদিন তিনি শুধু মুখ বুজিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। আবশ্যক কি! বেশ জানিতেন, একদিন সমস্ত প্রকাশ পাইবেই।

এখন দেখ তোমরা—এই এত ভালো, অত ভালো, গোকুলের সম্বন্ধে যা আমি বরাবর ভেবে এসেচি, ঠিক তাই কিনা!

কিন্তু কি এতদিন তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহারও যখন জানা ছিল না, তখন সকলকেই নীরবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইতে হইল এবং দেখিতে দেখিতে খড়ের আগুনের মত কথাটা মুখে মুখে প্রচার হইয়া গেল।অথচ গোকুল টের পাইল না যে, বাহিরের বিরুদ্ধ আন্দোলন তাহার বিপক্ষে এত সত্বর এরূপ তীব্র হইয়া উঠিল।

ভবানী চিরদিনই অল্প কথা কইতেন। তাহাতে কাল রাত্রি হইতে ব্যথার ভারে তাঁহার হৃদয় একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। গোকুলের স্ত্রী মনোরমা একসময়ে স্বামীকে নির্জনে ডাকিয়া এইদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, মার ভাবগতিক দেখচ?

গোকুল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, না। কি হয়েচে মার?

মনোরমা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, হবে আবার কি! সেই যে কাল বলেছিলুম ঠাকুরপোর টাকা নষ্ট করার কথা—সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা ক'ন না। তোমার সঙ্গে কথা-টথা কইচেন ত?

গোকুল শুষ্ক হইয়া কহিল, না, আমার সঙ্গেও না।

মনোরমা ঘাড়টা একটুখানি হেলাইয়া, কণ্ঠস্বর আরও নিচু করিয়া বলিল, দেখলে মজা! যে টাকাগুলো ঠাকুরপো দু'হাতে উড়িয়ে দিলে, সেগুলো থাকলে ত আমাদেরই থাকত। ঠাকুর ত আমাদেরই সব লিখে দিয়ে গেচেন। আমাদের তিনি সর্বনাশ করবেন—আর সে-কথা একটু মুখ থেকে খসালেই রাগ করে কথাবার্তা

বন্ধ করে দিতে হবে? এইটে কি ব্যবহার? তুমি ত ‘মা’ ‘মা’ করে অজ্ঞান, তুমিই বল না, সত্যি না মিছে?

গোকুলের মুখখানা একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। কোন রকম জবাবই সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রী বোধ করি তাহা লক্ষ্য করিয়াই কহিল, ঠাকুরপো যাই করুক আর যাই হোক, সে পেটের ছেলে। তুমি সতীনপো বৈ নয়। তুমি পেলে সমস্ত বিষয়—এ কি কোন মেয়েমানুষের সহ্য হয়? না না, আমার সব কথা অমন করে তোমার উড়িয়ে দিলে আর চলবে না। এখন থেকে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে, অমন ‘মা’ ‘মা’ করে গলে গেলে সবদিকে মাটি হতে হবে, বলে দিচ্ছি! বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস।

গোকুলের বুকের ভিতরটা অভূতপূর্ব শঙ্কায় গুরগুর করিয়া উঠিল। সে বিবর্ণমুখে ফ্যালফ্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী কহিল, আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মনের ভাব যত বুঝি, তোমরা পুরুষমানুষ তা পার না। আমার কথাটা শুনো। বলিয়া সে স্বামীর মুখের পানে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কতটা কাজ হইয়াছে অনুমান করিয়া লইয়া বেশ-একটু জোর দিয়া বলিল, আর ঠাকুরপোর ত চিরদিন এমনধারা বয়াটেপানা করে বেড়ালে চলবে না। তাঁকে লেখাপড়া ত তুমি আর কম শেখাও নি। এখন যা হোক একটু চাকরি-বাকরি করে মাকে নিয়ে বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে তাঁকে। তিনি নিজের মাকে ত সত্যি আর বরাবর আমাদের কাছে ফেলে রাখতে পারবেন না! তা ছাড়া, মাথা গুঁজে দাঁড়াবার যা হোক একটু কুঁড়েকাঁড়াও ত করা চাই। তখন আমরাও যেমন ক্ষমতা সাহায্য করব—লোক যেন না বলতে পারে, অমুক মজুমদার তার বৈমাত্র ভাইকে দেখলে না।

বৈমাত্র ভায়ের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? যারা বলে তারা বলুক, আমরা সে কথা বলতে পারব না। সে বংশ আমাদের নয়। বলিয়া সে স্বামীকে ভাবিবার অবকাশ দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

গোকুল স্বপ্নাবিষ্টের মত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া সেইখানে বসিয়া কি-সব যেন অদ্ভুত আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সব কথা ছাপাইয়া এই একটা কথা তাহার কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল—বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস! এবং শুধু সেইজন্যই মা যেন রাগ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া বিনোদের কাছে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন। তাহার মনে পড়িল তাহার স্ত্রী মিথ্যা বলে নাই। আজ সারাদিনের মধ্যে মায়ের সহিত তাহার একটা কথাও ত হয় নাই। কার্যোপলক্ষে তাঁহার সুমুখ দিয়া সে দু-তিনবার যাতায়াতও করিয়াছে, কিন্তু তিনি মুখ তুলিয়াও ত চাহেন নাই। মা চিরদিনই অত্যন্ত অল্পভাষিণী জানিয়া সে সময়টায় গোকুলের কিছুই মনে হয় নাই বটে, কিন্তু এখন সে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক যেন জলের মতই স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। অথচ এই সমস্ত চুপচাপ নীরব বিরুদ্ধতা সহ্য করাও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মার সহিত মুখোমুখি কলহ করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঢুকিয়াই বলিল, এমনধারা মুখভার করে কাজকর্মের বাড়িতে বসে থাকলে ত চলবে না মা!

ভবানী বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্রই গোকুল বলিয়া উঠিল, তোমার বৌ ত আর মিছে বলেনি যে, বিনোদ রাশ রাশ টাকা নষ্ট করচে! বাবা তার বিষয় যদি আমাকে দিয়ে যান, তাতে আমার দোষ কি? তুমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া কর গে, আমাদের উপর রাগ করতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি।

ভবানী মর্মাহত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি কারো ওপরেই রাগ করিনি গোকুল, কারো সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইনে।

যদি চাও না ত ওরকম করে থাকলে চলবে না। বিনোদকে ব'লো সে যেন চাকরি-বাকরি করে। আমার বাড়িতে তার জায়গা হবে না।

সে ত হবেই না গোকুল, এ আর বেশী কথা কি! বলিয়া ভবানী মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঝগড়া করিতে না পাইয়া গোকুল নিরুপায় ক্রোধে বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, আজ স্পষ্ট বলে দিলুম মাকে—বিনোদের এখানে আর থাকা হবে না—চাকরি-বাকরি করে যা ইচ্ছে করুক আমি কিছু জানিনে।

মনোরমা আহ্লাদে আগাইয়া আসিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বললেন উনি?

গোকুল অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত জবাব দিল, বলবেন আবার কি! আমি বলাবলির কি ধার ধারি!

বড়বৌ চোখ ঘুরাইয়া কহিল, তবু, তবু?

গোকুল তেমনি করিয়াই কহিল, তবু আর কি! তাঁকে স্বীকার করতে হ'লো যে—না, বিনোদের এ বাড়িতে থাকা চলবে না।

তাহার স্ত্রী গলা আরো খাটো করিয়া কহিল, এ ষোল আনা রাগের কথা, তা বুঝেচ? মার মন পড়ে রয়েচে নিজের ছেলেটির পানে—এখন তুমি হয়েচ তাঁর দু'চক্ষের বালি।

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আর বুঝিনি? আমার কাছে কি চালাকি চলে? বাহিরে আসিয়াই রসিক চক্রবর্তীকে সুমুখে পাইয়া কহিল, বলি একটা নতুন খবর শুনেচ চক্কোত্তিমশাই? এতকাল এত করে এখন আমিই হয়েচি মার দু'চক্ষের বিষ। কথাবার্তা আর আমাদের সঙ্গে ক'ন না, সুমুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে বসেন।

চক্রবর্তী অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, না না, বল কি বড়বাবু!

কি বলি? ওরে ও হাবুর মা, শোন শোন!

বাড়ির বুড়া ঝি কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, মনিবের ডাকাডাকিতে কাছে আসিবামাত্র গোকুল চক্রবর্তীর প্রতি চাহিয়া কহিল, একে জিজ্ঞেস করে

দেখ।—কি বলিস হাবুর মা, মাকে আমার সঙ্গে কথা কইতে আর দেখচিস? সুমুখে পড়লে বরং মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ত?

হাবুর মা কিছুই জানিত না। সে মূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, অবশেষে একটু ঘাড় নাড়িয়া মনিবের মন রাখিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সত্যি-মিথ্যে শুনলে ত? বলিয়া চক্রবর্তীর প্রতি একটা ইশারা করিয়া গোকুল অন্যত্র চলিয়া গেল।

সেদিন পাড়ার যে-কেহ দেখাশুনা করিতে আসিল, তাহারই কাছে সে বিমাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া, পুনঃপুনঃ এই একটা কথাই বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, আমি সতীনপো বৈ ত নয়! কাজেই বাবা মরতে-না-মরতেই দু'চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েচি!

সন্ধ্যার সময় বাড়ির ভিতরে আসিয়া ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার এত দায় পড়ে যায়নি যে, লোকজন পাঠিয়ে বর্ধমান থেকে ছোটপিসীমাদের আনতে যাব। এত গরজ নেই—আসতে হয় তিনি নিজে আসবেন।

ভবানী মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সেটা কি ভাল কাজ হবে গোকুল?

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভালোমন্দ জানিনে। দু'হাতে টাকা ওড়াবার আমার সাধ্যি নেই। তুমি এ নিয়ে আমাকে আর জেদ ক'র না, তা বলে দিচ্চি।

ইঁহাদিগকে আনাইবার জন্য ভবানীই কাল গোকুলকে আদেশ করিয়াছিলেন। এখন আর কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া হাতের কাজে মন দিলেন। তথাপি গোকুল সুমুখে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আনো বললেই ত আর আনতে পারিনে মা। ধারকর্জ করে ত আমি ডুবে যেতে পারব না।

ভবানী অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, বেশ ত গোকুল, ভাল বোঝো—নাই বা সেখানে লোক পাঠালে।

গোকুল বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, এখন থেকে আমাকে বুঝতেই হবে যে! আমার কি আর আপনার মা আছে! আমি ম'লেই বা কার কি—কে আর আমার আছে! এখন নিজেকে নিজে সামলানো চাই। টাকাকড়ি বুঝেসুঝে খরচ করা দরকার। নিজের মা ত নেই। বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তিতে অকস্মাৎ এতবড় আসক্তি দেখিয়া ভবানী নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু গোকুল তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমি কি বুঝিনে? এটা তোমার রাগের কথা নয়? কাল নিজে তুমি বললে, গোকুল, তোর পিসীমাদের লোক পাঠিয়ে আনা, আর আজ বলচ, যা ভাল হয় তাই কর্? আমার বাপ নেই, ভাই নেই বলে, আমাকে এমনি করে জব্দ করা! লোকে বলবে গোকুল বুঝি সত্যি সত্যিই তার মায়ের কথা শোনে না!

তাহার এই একান্ত অবোধ্য অভিযোগে ভবানী বিমূঢ় হতবুদ্ধির মত একমুহূর্ত তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, গোকুল, আমি ত তোদের কিছুতেই নেই—কোন কথাই ত বলিনি বাবা!

গোকুল অকস্মাৎ দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া কহিল, তোমার কোন্ হুকুমটা শুনিনে মা, যে তুমি আমাকে এমনি করে বলচ? কিন্তু ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি। বেন্দা লজ্জায়-ঘেন্নায় বাড়িছাড়া হয়ে গেল—আমারও যেখানে দু'চক্ষু যায় চলে যাব। থাকো তুমি তোমার বিষয়-আশয় নিয়ে। বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সাত

গোকুলের বড়মেয়ে হেমাঙ্গিনী তাহার ঠাকুরমার কাছে শুইত। সে ভোর হইতে-না-হইতে চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিল, কাকা এসেচে মা, কাকা এসেচে।

পাশের ঘরে গোকুল শুইয়াছিল। সে ধড়ফড় করিয়া কম্বলের শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। শুনিতে পাইল, তাহার স্ত্রী নিরানন্দ-বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিতেছে, কখন এল রে তোর কাকা?

মেয়ে কহিল, অনেক রাত্তিরে মা।

মা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি কচ্চে?

মেয়ে কহিল, এখনও ওঠেন নি। তিনি নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

তাহার মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। গোকুল দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া হাত নাড়িয়া মেয়েকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর ঠাকুরমা তাকে কি বললে রে হিমু?

হিমু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানিনে ত বাবা।

গোকুল তথাপি প্রশ্ন করিল, খুব বকলে বুঝি রে?

হিমু অনিশ্চিতভাবে বার-দুই মাথা নাড়িয়া অবশেষে কি মনে করিয়া বলিল, হুঁ।

গোকুল ব্যগ্র হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কহিল, তোর ঠাকুরমা কি কি সব বললে—বল ত মা হিমু।

হিমু বিপদে পড়িল। কাকা যখন আসেন, তখন সে ঘুমাইতেছিল—কিছুই জানিত না। বলিল, জানিনে ত বাবা!

গোকুল বিশ্বাস করিল না। অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, এই যে বললি, জানিস। মা তোকে মানা করে দিয়েচে, না? আমি কাউকে বলব না রে, তুই বল না।

জেরায় পড়িয়া হিমু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। গোকুল তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া উৎসাহ দিয়া কহিল, বল ত মা, কি কি কথা হ'ল? মা বুঝি বললে, বেরিয়ে যা তুই বাড়ি থেকে? এই নে দুটো টাকা নে—পুতুল কিনিস। বলিয়া সে বালিশের তলা হইতে টাকা লইয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল।

হিমু শুষ্ক হইয়া বলিল, হুঁ বললে।

তার পর? তার পর?

হিমু কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, তার পরে ত জানিনে বাবা।

গোকুল পুনরায় তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, জানিস বৈ কি! তোর কাকা কি বললে?

কিচ্ছু বললে না।

গোকুল বিশ্বাস করিল না। বিরক্ত ও কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, একেবারে কিছুই বললে না? তা কি হয়?

পিতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া হিমু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানিনে ত বাবা।

ফের জানিস নে? হারামজাদা মেয়ে? বলিয়া সে চটাস্ করিয়া মেয়ের গালে চড় কসাইয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হ।

মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

গোকুল দ্রুতপদে নীচে নামিয়া তাহার বিমাতার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তা বেশ করেচ! সে বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই নানারকম করে নাগিয়েচ, ভাঙিয়েচ—আমার ওপর যাতে তার মন ভেঙ্গে যায়—এই ত? সে-সব কিছু আমার আর শুনতে বাকী নেই। কিন্তু তোমার ছেলেকেও সাবধান করে দিয়ো—আমার সুমুখে না পড়ে, তা বলে দিয়ে যাচ্চি। বলিয়াই তেমনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ভবানী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বাহিরের নানা লোক নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। সে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক করিয়া হাবুর মাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, ও হাবুর মা, বলি, ভায়া যে বাড়ি এসেচেন, শুনেচিস?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ বাবু, ঘোর রাত্তিরে ছোটবাবু বাড়ি এলেন।

গোকুল কহিল, সে ত জানি রে। তার পরে মায়ে-ব্যাটায় কি কি কথা হলো? আমার নামে বুঝি মা খুব করে লাগালে? বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার-টাবার কথা—

ঝি বাধা দিয়া কহিল, না বড়বাবু, মা ত ওঠেন নি। যদু তার ব্যাগটা নিয়ে এলে আমি ছোটবাবুর ঘর খুলে আলো জ্বেলে দিলুম। তিনি সেই যে ঢুকলেন আর ত বার হননি।

গোকুল অপ্রত্যয় করিয়া কহিল, কেন ঢাকচিস ঝি? আমি যে সব শুনেচি।

গোকুলের কথা শুনিয়া ঝি বিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তার পরে হাবুর দিব্যি করিয়া বলিল, অমন কথাটি ব'লো না বড়বাবু। আমি সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবাবুর কাজকর্ম করে দিলুম। তিনি মাকে ডাকতে নিষেধ করে বললেন, ঝি, আর আমার কিছু দরকার নেই। তুই শুধু আলোটা জ্বেলে দিয়ে শুগে যা। আহা! চোখ-মুখ বসে গিয়ে এক্কেবারে কালিবণ্ণ হয়ে গেছে।

গোকুলের চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল, তা আর হবে না? তুই বলিস কি হাবুর মা, বাবা মারা গেলেন, ছোঁড়া একবার চোখের দেখাটা দেখতে পেলে না—একটা পয়সার বিষয়-আশয় পর্যন্ত পেলে না—তার মনে মনে যা হচ্ছে, তা সেই জানে। বাবাকে সে কি ভালই বাসত, তা তোরা সব জানিস? কি বলিস হাবুর মা? বলিতে বলিতেই গোকুলের চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

হাবুর মা অনেকদিনের দাসী। চোখের জল দেখিয়া তাহার চোখেও জল আসিল। গাঢ়স্বরে কহিল, তা আর বলতে বড়বাবু! তেনার বাবা-অন্ত প্রাণ ছিল

যে! তবে কিনা বড় বড় লেখাপড়া করতে করতে মগজটা কেমনধারা যে গরম হয়ে গেল—তাই—

গোকুল হাবুর মাকে একেবারে পাইয়া বসিল। কহিল, তাই বল না হাবুর মা। মগজটা গরম হবে না? বিদ্যেটা কি সে কম শিখেচে! অনার গ্রাজুয়েট্! বলি, এই হুগলি-চুঁচড়ো-বাবুগঞ্জে ক'টা লোক আমার ভায়ের মত বিদ্যে শিখেচে—কৈ দেখিয়ে দে দেখি? লাটসাহেব নিজে এসে যে তাকে হাত ধরে বসায়—সে কি একটা হেঁজিপেঁজি মানুষ! তুই ত ঝি, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে কোন ভদ্রলোককে বল্ গে দেখি যে, তুই বিনোদবাবুদের বাড়ির দাসী! তোকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে হাজারটা খবর নেবে, তা জানিস? কিন্তু ঐ যে কথায় বলে গাঁয়ের যুগী ভিক্ষে পায় না! এখানকার কোন ব্যাটা কি তারে চিনতে পারলে? মুখখানি একবারে শুকিয়ে গেছে দেখলি, না রে ?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মুখখানি দেখলে চোখে আর জল রাখা যায় না বড়বাবু!

গোকুলের চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয় অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, তুই তাকে মানুষ করেচিস হাবুর মা, তুই শুধু তাকে চিনতে পেরেচিস। আহা! চিরটা কাল তার হেসেখেলে আমোদ-আহ্লাদ করে লেখাপড়া নিয়েই কেটেচে। কবে এ-সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয়েচে, বল দেখি? আর উইল করে বিষয় দেব না বললেই দেব না! তার বাপের বিষয় নয়? কোন্ শালা আটকায়? কি করেচে সে? চুরি করেচে? ডাকাতি করেচে? খুন করেচে? কোন্ শালা দেখেচে? তবে কেন বিষয় পাবে না বল দেখি শুনি? আইন-আদালত নেই? বিনোদ নালিশ করলে আমাকে যে বাবা বলে অর্ধেক বিষয় কড়ায়-গণ্ডায় তাকে চুলচিরে ভাগ করে দিতে হবে তা জানিস!

ঝি সায় দিয়া বলিল, তা দিতে হবে বৈ কি বাবু!

গোকুল উৎসাহে চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া কহিল, তবে তাই বল না! আর এই মা-টি! তুই মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক না কেন? তুই কেন উইল করার মতলব দিতে গেলি? এইটে কি তোর মায়ের মত কাজ হ'লো? ধর্ম নেই? তিনি দেখচেন না? নির্দোষকে কষ্ট দিলে—তাঁর কাছে তোকে জবাব দিতে হবে না? আর বিষয়! ভারী বিষয়—আজ বাদে কাল সে যখন হাইকোর্টের জজ হবে—সে ত আর কেউ তার আটকাতে পারবে না—তখন কি করে রাখবি বিষয়? এ-সব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে না? এখন স-মানে না দিলে, তখন অপমান হয়ে দিতে হবে যে!

হাবুর মা খুশী হইয়া উঠিল। সে বিনোদকে মানুষ করিয়াছিল—এই সমস্ত উইল-টুইল তাহার একেবারে ভালই লাগে নাই; কহিল, আচ্ছা বড়বাবু, তুমি তাই কেন ছোটবাবুকে ডেকে বল না যে, তোর বিষয়-আশায় ভাই তুই নে! তুমি দিলে ত আর কারুর না বলবার জো নেই।

কিন্তু এইখানেই ছিল গোকুলের আসল খটকা। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তবে সবাই যে বলে, আমার দেবার সাধ্যি নেই। বাবার উইল ত রদ করতে পারিনে হাবুর মা। আমাদের বড়বৌর মামাত ভাই একজন মস্ত মোক্তার—সে নাকি তার বোনকে চিঠি লিখেচে, তা হলে জেল খাটতে হবে। তবে যদি মা রাজী হয়, বড়বৌ রাজী হয়, তখন বটে।

হাবুর মা ইহার সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল।

গোকুল মুখ ফিরাইতেই দেখিল হিমু খেলা করিতে যাইতেছে। তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর কাকা উঠেচে রে?

হিমু ঘাড় কাত করিয়া কহিল, হুঁ, উঠেই তার বসবার ঘরে চলে গেলেন—কারু সঙ্গে কথা কইলেন না।

বাটীর একান্তে পথের ধারের একটা ঘরে বিনোদ বসিত। ঘরখানি ইংরাজি ধরনে সাজানো ছিল—এইখানেই তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা দেখাসাক্ষাৎ

করিতে আসিত। গোকুল পা টিপিয়া কাছে গিয়া জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, বিনোদ চৌকিতে না বসিয়া নীচে মেঝের উপর ওদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই বসিবার ধরন দেখিয়াই গোকুলের দুটি চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ছোট-ভাইয়ের মুখখানি দেখিবার আসায় মিনিট-পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়া শেষে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া আসিল।

চক্রবর্তী কহিল,বড়বাবু, অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দটা—

গোকুল সহসা যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কহিল, এ-সব বিষয়ে আমাকে আর কেন জড়াও চক্কোত্তিমশাই। মা সরস্বতী ত স্বয়ং এসে পড়েছেন। কে কেমন পণ্ডিত, কার কত মান-মর্যাদা বিনোদের কাছে ত চাপা নেই—তাকেই জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নাও না কেন। আমি এর মধ্যে আর হাত দেব না, চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্তী কহিল, কিন্তু ছোটবাবু ত এখনো ঘুম খেকে উঠেন নি।

গোকুল ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, ঘুম থেকে! তার কি আহার-নিদ্রা আছে? হাবুর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—সে স্বচক্ষে দেখেচে। বলে, বড়বাবু, ছোটবাবুর মুখের পানে চাইলে আর চোখের জল রাখা যায় না—এমনি চেহারা হয়েছে। ভেবে ভেবে সোনার বর্ণ যেন কালিমাড়া হয়ে গেছে। বলিয়া তাহার বসিবার ঘরটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিল, গিয়ে দেখ গে—সে ঠাণ্ডা মাটির উপর একলাটি চুপ করে বসে আছে। সে দেখলে কার না বুক ফেটে যায়, বল ত চক্কোত্তিমশাই!

চক্রবর্তী দুঃখসূচক কি-একটা কথা অস্ফুটে কহিয়া ফর্দ লইয়া যাইতেছিল, গোকুল তাহাকে ফিরাইয়া ডাকিয়া কহিলো, আচ্ছা, তুমি ত সমস্তই জানো—তাই জিজ্ঞাসা করি, আমি থাকতে বিনোদকে আর এত কষ্ট দেওয়া কেন? উপোস-তিরেশ কি ওর ওই রোগা দেহতে সহ্য হবে? হয়ত বা অসুখ হয়ে পড়বে। আমি বলি—খাওয়া-শোওয়া ওর যেমন অভ্যাস তেমনি চলুক!

চক্রবর্তী নিরুৎসাহভাবে কহিল, না পারলে—

কথাটা গোকুল শেষ করিতেই দিল না। বলিল, পারবে কি করে, তুমিই বল দেখি? আমাদের এ-সব কুলি-মজুরের দেহ—এতে সব সয়। কিন্তু ওর ত তা নয়। পাঁচ-সাতটা পাশ করে যে দেশের মাথার মণি হয়েচে, তার দেহতে আর আমার দেহতে তুমি তুলনা করে বসলে? কে আছিস রে ওখানে—ভূতো? যা ত একবার চট করে আমাদের ভশ্চায্যিমশাইকে ডেকে আন। না হয় যত টাকা লাগে—শ্রাদ্ধের সময় আমি মূল্য ধরে দেব। তা বলে ত মায়ের পেটের ভাইকে মেরে ফেলতে পারব না। ওকে আমি আলোচালের হবিষ্যি করিয়ে নিকেশ করতে পারব না, এতে তিনি যাই বলুন।

চক্রবর্তী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সায় দিয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা বড়বাবু। তবে কিনা লোকে বলবে—

আরে লোকে কি বলবে বলে কি নিজের ভাইটাকে মেরে ফেলব? তোমার এ-সব কি বুদ্ধি হ'লো, বল ত চক্কোত্তিমশাই? না না, ফর্দ-টর্দ নিয়ে তোমার এখন তাকে জ্বালাতন করার দরকার নেই। মুখে যা হোক একটু-কিছু দিয়ে আগে সে সুস্থ হোক, বলিয়া গোকুল নিতান্ত অকারণেই সে বেচারার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আট

চায়ের বাটিটা বিনোদ ব্রাহ্মণের হাত হইতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু সে বস্তুটা যে কত গোপনে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পাত্রটা যে কাহার বুকের উপর গিয়া কতখানি আঘাত করিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

সমস্তদিনের মধ্যে বিনোদ অনেকেরই সহিত কিছু কিছু কথাবার্তা কহিল বটে, কিন্তু বড়ভাইয়ের ছায়া দেখিলেও সে সরিয়া যাইতে লাগিল। অথচ সে ছায়াও তাহাকে মুহূর্তের অবকাশ দেয় না। বিনোদ যেদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, গোকুল কাজের ঝঞ্ঝাটে হঠাং সেইদিকেই আসিয়া পড়ে। এমনি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।

অপরাহ্নবেলায় বিনোদ বসিবার ঘরে একা বাসিয়া ছিল, একখানা কাগজ হাতে করিয়া গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল। অকারণে খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, কলিকাতার বাসা ছেড়ে তুমি হাজারিবাগে হঠাৎ চলে গেলে—বাবা মৃত্যুকালে—সে শুনেচ বোধ হয়—সে একটা তামাশা আর কি! বলিয়া গোকুল পুনরায় শুষ্কহাসির অভিনয় করিয়া কহিল, তা তোমার যেমন কাণ্ড, একটা খবর পর্যন্ত দেওয়া নেই; তা যাক, সে-সব হবে অখন—কাজটা চুকে যাক—একটা দানপত্র লিখলেই—বুঝলে না বিনোদ—গোটা-কয়েক টাকা শুধু বাজে খরচ হয়ে যাবে—বুঝলে না—আর শালার লোক যা এখানকার—জানোই ত সব—বুঝলে না ভাই—তা সে কিছুই না—বাবাও বলে গেলেন বিষয়-আশয় তোমাদের দুই ভায়ের রইল, এ একটা শুধু বুঝলে—না—তা যাক—সেজন্য কিছুই আটকাবে না—আর আমার ত মেজাজের ঠিক নেই ভাই। এই লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুমি রাখ। আবার পণ্ডিতদের আহ্বান করা হয়েচে, কার কত বিদায়, কে কি দরের লোক, সে তুমি ঠিক করে না দিলে ত আর কেউ পারবে না। কিন্তু আমার ত এমন

ফুরসত নেই যে, দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড তোমার সঙ্গে দুটো পরামর্শ করি। বলিয়া গোকুল চাবিটা এবং কাগজখানা কোনমতে সুমুখে ধরিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া অবধি এই কথাগুলোই সে মনে মনে মক্‌শ করিতেছিল। বিনোদ হাত দিয়া সেগুলা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আমাকে এর মধ্যে আপনি জড়াবেন না—এ-সব আমি ছোঁব না।

একমুহূর্তেই গোকুলের দাঁতের হাসি পাথরের মত জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার সারা দিনের জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিল। কহিল, ছোঁবে না? কেন?

বিনোদ কহিল, আমার আবশ্যক কি? আমি বাইরের লোক, দু'দিনের জন্যে এসেচি—দু'দিন পরেই চলে যাব।

গোকুল কহিল, চলে যাবে?

বিনোদ বলিল, যেতেই ত হবে। তা ছাড়া এ-সব টাকাকড়ির ব্যাপার। আমি দীন-দুঃখী, হিসাব মিলিয়ে দিতে না পারলে চোর বলে তখন আপনিই হয়ত আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়বেন।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট দুটা একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। তার পর হেঁট হইয়া চাবি এবং কাগজটা তুলিয়া বাহির হইয়া গেল। পিতৃশ্রাদ্ধে জাঁকজমক করিয়া নাম কিনিবার ইচ্ছা তাহার মনের ভিতর হইতে মরীচিকার মত মিলাইয়া গেল।

অথচ আজ সকাল হইতেই তাহার উৎসাহ এবং চেঁচামেচির বিরাম ছিল না। সহসা সন্ধ্যার পরেই সে আসিয়া যখন তাহার কম্বলের শয্যাশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

তোমার কি অসুখ করেচে?

গোকুল উদাসভাবে কহিল, না বেশ আছি।

তবে, অমন করে শুলে যে?

গোকুল জবাব দিল না। মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা-টথা কিছু হ'লো?

গোকুল কহিল, না।

তখন বড়বধূ অদূরে মেঝের উপর বেশ করিয়া আসন গ্রহন করিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, ঠাকুরপো কি বলে বেড়াচ্ছে শুনেচ?

গোকুল মৌন হইয়া রহিল। মনোরমা তখন আরোও একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, বলে, বাবার ব্যামো-স্যামো কিছুই জানিনে, হাজারিবাগ না কোথায়—কত ফন্দিই জানে তোমার এই ভাইটি!

গোকুল নিরীহভাবে প্রশ্ন করিল, ফন্দি কেন? তুমি বিশ্বাস কর না?

মনোরমা বলিল, আমি? আমি ন্যাকা? এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও করিনে।

কথাটা গোকুলের অত্যন্ত বিশ্রী লাগিল। তাহার এই অসাধারণ চারটে পাশ-করা কূলপ্রদীপ ভাইটির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। কিন্তু আজ নাকি তাহার বুকজোড়া ব্যথায় সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই সে চুপ করিয়াই রহিল। ঘরে প্রদীপ ছিল বটে, কিন্তু সে আলোক তেমন উজ্জ্বল ছিল না—মনোরমা তাহার স্বামীর মুখের ভাবটা ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, খুব সাবধান, খুব সাবধান! এখন অনেকরকম ফন্দি-ফিকির হতে থাকবে—কিছুতে কান দিও না। বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে একটি কাজও করতে যেয়ো না যেন। কাল সকালের গাড়িতেই তিনি এসে পড়বেন—আমি অনেক করে চিঠি লিখে দিয়েচি। যাই বল, বাবা না এলে আমার কিছুতে ভয় ঘুচবে না।

গোকুল উঠিয়া বলিল, তোমার বাবা কি আসবেন?

আসবেন না? তিনি না এলে এ সময়ে সামলাবে কে? নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তের বাবাই হলেন সর্বেসর্বা। কিন্তু তা বলে এমন বিপদে মেয়ে-জামাইকে তিনি ত ফেলে দিতে পারবেন না!

গোকুল চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। মনোরমা অত্যন্ত খুশী এবং ততোধিক উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল, তোমার দোকানপত্র যা-কিছু ফেলে দাও বাবার ঘাড়ে। আর কি কাউকে কিছু দেখতে হবে? শুধু বলবে, আমি জানিনে বাবা জানেন। ব্যস! তখন ঠাকুরপোই বল, আর যেই বল, কারু সাধ্যি হবে না যে তাঁর কাছে দাঁত ফোটাবেন। বুঝলে না? বলিয়া মনোরমা একান্ত অর্থপূর্ণ একটা কটাক্ষ করিল। ম্লান আলোকে গোকুল তাহা দেখিতে পাইল কি না, বলা যায় না; কিন্তু সে হাঁ-না কোন কথাই কহিল না। তাহার পরেও অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াও মনোরমা যখন আর স্বামীর নিকট হইতে কোন সাড়াই পাইল না, তখন বাতাসটা যে কোন্-মুখো বহিতেছে, তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া সে সে-রাত্রির মত ক্ষান্ত দিল। সকালবেলা গোকুল অতিশয় ব্যস্তভাবে ভবানীর ঘরের সুমুখে আসিয়া কহিল, মা, লোহার সিন্দুকের চাবিটা কি বিনোদ তোমার কাছে রেখে গেছে?

ভবানী সংক্ষেপে বলিলেন, কৈ না।

চাবিটা গোকুলের নিজের কাছেই ছিল। কিন্তু সে মনে মনে অনেক মতলব করিয়াই এই মিথ্যাটা আসিয়া কহিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এমন জিনিসটা বিনোদের হাতে দেওয়া সম্বন্ধে মা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু মায়ের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মুখে তাহার সমস্ত কৌশলই ভাসিয়া গেল। তখন সে ম্লানমুখে আস্তে আস্তে কহিল, কি জানি, সে-ই কোথায় রাখলে, না আমিই কোথায় ফেললুম!

ভবানী কোন কথাই কহিলেন না। এই ভিড়ের বাড়িতে সিন্দুকের চাবির উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না, এ-সংবাদেও মা যখন কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ

করিলেন না এবং এই তাঁহার একান্ত নির্লিপ্ততা গোকুলের বুকে যে কি শূল বিঁধিল, তাহাও যখন তিনি চোখ তুলিয়া একবার দেখিলেন না, তখন সে যে কি বলিবে, কি করিয়া মাকে সংসার সম্বন্ধে সচেতন কবিয়া তুলিবে, তাহার কোন কূলকিনারাই চোখে দেখিতে পাইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, শম্ভু আর দরবারী পিসীমাদের যে আনতে গেল, কৈ তারাও ত এখনো এসে পড়ল না!

ভবানী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, কি জানি, বলতে পারিনে ত!

গোকুল বলিল, ভাগ্যে লোক পাঠাতে তুমি বলেছিলে মা! এখন না আসেন, তাঁদের ইচ্ছে। কিন্তু আমরা ত দোষ থেকে খালাস হয়ে গেলুম। তুমি যে কতদূর ভেবে কাজ কর মা, তাই শুধু আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি। তুমি না থাকলে আমাদের—

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুলের মুখের এমন কথাটাতেও তাঁহার গম্ভীর বিষণ্ণ-মুখে সন্তোষ বা আনন্দের লেশমাত্র দীপ্তি প্রকাশ পাইল না। গোকুল অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই গোকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে জেলার নূতন ডেপুটি এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিনোদ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা কহিতেছে।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের কাছে ছোটভায়ের পরিচয়টা কোন সুযোগে দিয়া ফেলিবার জন্য গোকুল একেবারে ছটফট করিতে লাগিল। অথচ বিনোদের সমক্ষে তাহারই চারটে পাশ করার খবর দিবার উপায় ছিল না—সে তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত।

সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হাকিমের সুমুখে আসিয়া একেবারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিল এবং একান্ত বিনয়ের সহিত কহিল, এটি আমার ছোটভাই বিনোদ—অনার গ্রাজুয়েট।

বিনোদ ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে বড়ভায়ের মুখের প্রতি চাহিল; কিন্তু গোকুল ভ্রূক্ষেপও করিল না; কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, আমার সাতপুরুষের ভাগ্য যে আপনি এসেচেন—বিনোদ, হাকিমের সঙ্গে ইংরিজীতে আলাপ কচ্চ না কেন? ওঁরা হাকিম হুজুর; ওঁদের কি বাংলায় কথা কওয়া সাজে? পাঁচজনে শুনলেই বা তোমাকে বলবে কি?

আশেপাশের ভদ্রলোকেরা মুখ তুলিয়া চাহিল। ডেপুটিবাবু সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং অসহ্য লজ্জায় বিনোদের সমস্ত চোখ-মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে ভালমতেই জানিত। সুতরাং নিরস্ত করিতে না পারিলে দাদা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন, তাহার কোন হিসাব-নিকাশই ছিল না।

একটা কথা শুনুন, বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই হাত ধরিয়া গোকুলকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আমাকে কি আপনি এক্ষুণি বাড়ি থেকে তাড়াতে চান? এ-রকম করলে আমি ত একদণ্ডও টিকতে পারিনে।

গোকুল ভীত হইয়া কহিল, কেন? কেন ভাই?

কতদিন বলেচি আপনার এ অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারিনে; তবু কি আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? আমার মতন পাশ-করা লোক গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে! বলিয়া বিনোদ ক্ষোভে অভিমানে মুখখানা বিকৃত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

গোকুল লজ্জায় এতটুকু হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বোধ করি বলিতে বলিতে গেল, এরূপ কর্ম সে আর করিবে না। অথচ আধ-ঘণ্টা পরে বিনোদ এবং বোধ করি উপস্থিত অনেকের কানে গেল—গোকুল চীৎকার করিয়া একটা

ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ছোটবাবুর অনার গ্রাজুয়েটের সোনার মেডেলটা যেন সকলে হাতে করিয়া, ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া, নোংরা করিয়া না ফেলে।

ডেপুটিবাবু একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

নয়

নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করিয়া গোকুলের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাকা চুল, কাঁচা গোঁফ, বেঁটে আঁটসাঁট গড়ন। অত্যন্ত পাকা লোক। আড়তের ছোঁড়ারা আড়ালে বলিত, বাস্তুঘুঘু। শ্রাদ্ধবাটীতে একমুহূর্তেই তিনি কর্মকর্তা হইয়া উঠিলেন এবং ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই পাড়াসুদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া ফেলিলেন। এই কর্মদক্ষ হিসাবী শ্বশুরকে পাইয়া গোকুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আত্মীয়-বান্ধবেরা সবাই শুনিল, মেয়ে-জামাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি ব্যবসা হাতে লইবার জন্য দয়া করিয়া আসিয়াছেন।

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে, খাওয়ান-দাওয়ানও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কর্তাবাবু আহ্বান করিয়াছেন। গোকুল সসম্ভ্রমে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুরমশাই—নিমাই রায়, বহুমূল্য কার্পেটের আসনে বসিয়া দৌহিত্রীকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিয়াছেন, অদূরে কন্যা মনোরমা মাথার আঁচলটা অমনি একটু টানিয়া দিয়া সৎ-শাশুড়ীর আসল পরিচয়টা চুপি চুপি পিতৃসকাশে গোচর করিতেছে, এমনি সময়ে গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্বশুরমশাই ক্ষীরের বাটিটা একচুমুকে নিঃশেষ করিয়া, বাটির কানায় গোঁফটা মুছিয়া লইয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, বাবাজী, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে। বলি হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ফসকে গেলে কি আর ফেরানো যায়?

গোকুল হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, আজ্ঞে না।

নিমাই কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু স্নিগ্ধ-গম্ভীর হাস্য করিয়া জামাতাকে কহিলেন, তবে?

এই 'তবে'র উত্তর জামাতা কিন্তু আকাশ-পাতাল খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই ভূমিকাটি ধীরে ধীরে জমাট করিয়া তুলিতে

লাগিলেন; কহিলেন, বাবাজী, তোমরা ছেলেমানুষ দুটিতে যে কান্নাকাটি করে আমাকে এই তুফানে হাল ধরতে ডেকে আনলে—তা হাল আমি ধরতে পারি, ধরবও, কিন্তু তোমাদের ত ছটফট করলে চলবে না বাবা। যেখানে বসতে বলব, যেখানে দাঁড়াতে বলব, ঠিক তেমনি করে থাকা চাই, তবেই ত এই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারব। বিনোদ বাবাজী হাজারীবাগে ছিলেন, এই যে-সব এলোমেলো কথা যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্চ, এটা কি হচ্চে? এ যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হচ্চে, সেটা কি বিবেচ্য করতে পারচ না?

পিতার বক্তৃতা শুনিয়া কন্যা আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, হচ্চেই ত বাবা। তাইতে ত তোমাকে আমরা ডেকে এনেচি। আমরা কিছু জানিনে—তুমি যা বলবে, যা করবে, তাই হবে। আমরা জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করবো না, তুমি কি করচ না করচ।

পিতা খুশী হইয়া কহিলেন, এই ত আমি চাই মা! মামলা-মকদ্দমা অতি ভয়ানক জিনিস। শোননি মা, লোকে গাল দেয়, 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক'। সেই মামলা এখন তোমাদের ঘরে। আমাদের নাকি বড় পাকা মাথা, তাই সাহস করচি, তোমাদের আমি কিনারায় টেনে তুলে দিয়ে তবে যাব—এতে আমার নিজের যাই হোক। একটি একটি করে তাঁদের গলা টিপে বার করব, তবে আমার নাম বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়। বলিয়া তিনি মুখের ভাবটা এমনধারাই করিলেন যে, ওয়াটারলুর লড়াই জিতিয়া ওয়েলিংটনের মুখেও বোধ করি অতবড় গর্ব প্রকাশ পায় নাই। গলা বাড়াইয়া দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মা মনু এইখানেই আমার হাতে একটু জল দে, মুখটা ধুয়ে ফেলি; আর বাইরে যাব না। আর অমনি একটু বেরিয়ে দেখ মা, কেউ কোথাও কান পেতে-টেতে আছে কি না। বলা যায় না ত—এ হ'লো শত্রুর পুরী।

মনোরমা যথানির্দ্দিষ্ট কর্তব্য সমাপন করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিল। গোকুল বিহ্বল বিবর্ণ-মুখে একবার স্ত্রীর প্রতি, একবার

শ্বশুরের প্রতি চাহিতে লাগিল। এতক্ষণ ধরিয়া পিতাপুত্রীতে যত কথা হইল, তাহার একটা বর্ণও বুঝিতে পারিল না। এ কাহাদের কথা, কাহার ঘরে মামলা ঢুকিল, কাহাকে গলা টিপিয়া কে বাহির করিতে চায়, কাহার কি সর্বনাশ হইল—প্রভৃতি ঈশারা-ইঙ্গিতের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য গ্রহন করিতে না পারিয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

নিমাই কহিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবাজী, একটু স্থির হয়ে বসো—দুটো কথাবার্তা হয়ে যাক।

গোকুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই তোমাদের সুসময়। যা করে নিতে পার বাবা, এইবেলা। কিন্তু একটা সর্বনেশে মকদ্দমা যে বাধবে, সেও চোখের উপরই দেখতে পাচ্চি। তা বাধুক, আমি তাতে ভয় খাইনে—সে জানে হাটখোলার যদু উকিল আর তারিণী মোক্তার। বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের নাম শুনলে বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার কৌঁসুলীর মুখ শুকিয়ে যায়—তা এ তো একফোঁটা ছোঁড়া—না হয় দু'পাতা ইংরিজী পড়েছে।

গোকুল আর থাকিতে না পারিয়া সভয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, আপনি কার কথা বলচেন? কাদের মকদ্দমা?

এবার অবাক হইবার পালা—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি গভীর বিস্ময়ে গোকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মনোরমা ব্যাকুল হইয়া সজোরে বলিয়া উঠিল, দেখলে বাবা, যা বলেচি তাই। জিজ্ঞাসা করচেন কার মকদ্দমা! তোমার দিব্যি করে বলচি বাবা, এঁর মত সোজা মানুষ আর ভূ-ভারতে নেই। এঁকে যে ঠাকুরপো ঠকিয়ে সর্বস্ব নেবে সে কি বেশী কথা? তুমি এসেচ, এই যা ভরসা, নইলে সোম-বচ্ছরের মধ্যে দেখতে পেতে বাবা, তোমার নাতি-নাতকুড়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়েচে।

নিমাই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। তা যাক, আর সে ভয় নেই—আমি এসে পড়েচি। কিন্তু তোমাদের আড়তের ঐ-সব চক্কোত্তি-ফক্কোত্তিকে আমি

আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্ছে—বরের মাসী কনের পিসী, বুঝলে না মা! ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিনোদের দলে যোগ দেয় ত আমার নামই নিমাই রায় নয়। লোকের ছায়া দেখলে তার মনের কথা বলতে পারি। বলিয়াই নিমাই একবার গোকুলের প্রতি, একবার কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিল, এখ্‌খুনি এখ্‌খুনি! আমি আর জানিনে বাবা, সব জানি। জেনেশুনেও বোকা হয়ে বসে আছি। তোমার যাকে খুশি রাখো, যাকে খুশি তাড়াও, আমরা কথাটি ক'ব না।

এতক্ষণে গোকুল সমস্তটা বুঝিতে পারিল। তাহার ছোটভাই বিনোদ তাহারই বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে। অথচ ইহারা যখন তাহার সমস্ত অভিসন্ধিই বুঝিয়া ফেলিয়াছে, সে শুধু নির্বোধের মত সেই ছোটভাইকে প্রসন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রথমটা তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ঐ একটি মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সমস্ত নিবিয়া গিয়া, নিদারুণ অন্ধকারে তাহার দৃষ্টি, তাহার বুদ্ধি, তাহার চৈতন্যকে পর্যন্ত যেন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার দুই কানের মধ্যে কত লোক যেন ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—বিনোদ তাহার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছে। নিমাই কহিলেন, টাকার দিকে চাইলে হবে না বাবাজী, সাক্ষীদের হাত করা চাই। তাঁদের মুখেই মকদ্দমা। বুঝলে না বাবাজী!

গোকুল মাথা ঝুঁকাইয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, বুঝিল কি না তাহার জবাব দিল না। বোধ করি কথাটা তাহার কানেও যায় নাই।

কিন্তু তাঁহার কন্যার কানে গিয়াছিল। সে ঢালা হুকুমও দিল, অবশ্য কন্যা এবং জামাতা একই পদার্থ এবং অন্যান্য বিষয়ে তার কথাতেই কাজ চলিতে পারে বটে; কিন্তু এই সাক্ষীর বাবদে গোপনে টাকা খরচ করিবার অবারিত হুকুমটা জামাতা বাবাজীর মুখ হইতে ঠিক না পাইয়া রায়মহাশয়ের উৎসাহের প্রাখর্যটা যেন ঢিমা পড়িয়া গেল। বলিলেন, আচ্ছা সে-সব পরামর্শ কাল-পরশু

একদিন ধীরে সুস্থে হবে অখন। আজ যাও বাবাজী, হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলটল খাও, সারাদিন—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই গোকুল হঠাৎ নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। রায়মহাশয় মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বাবাজী ত কথাই কইলে না! টাকা ছাড়া কি মামলা-মকদ্দমা করা যায়? বিপক্ষের সাক্ষী ভাঙ্গিয়ে নেওয়া কি শুধু-হাতে হয় রে বাপু! ভয় করলে চলবে কেন?

নিমাই পাকা লোক। মানুষের ছায়া দেখিলে তার মনের ভাব টের পান। সুতরাং গোকুলের এই নিরুদ্যম স্তব্ধতা শুধু যে টাকা খরচের ভয়েই, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সময় লাগে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের এই ঘোর বিপদের দিনেও ত তিনি আর অভিমান করিয়া দূরে থাকিতে পারেন না। বিনা হিসাবে অর্থব্যয় করিবার গুরুভার তাঁহার মত আপনার লোক ছাড়া কে আর মাথায় লইতে আসিবে? কাজেই নিজের যতই কেন ক্ষতি হোক না, এমন কি কুণ্ডুদের আড়তের কাজটা গেলেও তাঁর পশ্চাদপদ হইবার জো নাই। লোকে শুনিলে যে গায়ে থুথু দিবে। গোকুল চলিয়া গেলে, এমনি অনেক প্রকারের কথায়, অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি তাঁর বিপদগ্রস্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

দশ

সামান্য কারণেই গোকুলের চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিত। তাহাতে সারারাত্রি জাগিয়া সকালবেলা যখন সে তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই একান্ত রুক্ষমূর্তি দেখিয়া ভবানী ভীত হইলেন। গোকুল ঘরে পা দিয়া কহিল, ওঃ—সৎমা যে কেমন তা জানা গেল।

একে ত এই কথাটা সে আজকাল পুনঃপুনঃ কহিতেছে; তাহাতে ও অন্যান্য নানা প্রকারে উক্ত্যক্ত হইয়া ভবানীর নিজের স্বাভাবিক মাধুর্য নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহিরের লোক, আত্মীয়-কুটুম্বেরা তখনও নাকি বাটীতে ছিল তাই তিনি কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, কি হয়েচে?

গোকুল লাফাইয়া উঠিল। কহিল, হবে কি? কি করতে পার তোমরা? বেন্দা নালিশ করে কিছু করতে পারবে না তা বলে দিয়ে যাচ্চি—এদিকে ঈশের মূল আছে। নিমাই রায়—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়, সোজা লোক নয়, তা জেনে রেখো।

ভবানী ক্রোধ ভুলিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদ নালিশ করবে, এ কথা তোমাকে কে বললে?

গোকুল কহিল, সবাই বললে। কে না জানে যে, বিনোদ আমার নামে নালিশ করবে?

ভবানী বলিলেন, কৈ আমি ত জানিনে।

আচ্ছা, জানো কি না, সে আমরা দেখে নিচ্চি! বলিয়া গোকুল সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সহসা তাহার শ্বশুরের কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমাদের মত শত্রুদের আমি ত আর বাড়িতে রাখতে পারিনে!

কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুদ্রমূর্তি ভয়ে বিবর্ণ এবং ক্ষুদ্র হইয়া গেল। এবং ব্যাধের আকৃষ্ট ধনুর সন্মুখ হইতে ভয়ার্ত মৃগ যেমন করিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া পলায়, গোকুলও ঠিক তেমনিভাবে মায়ের সুমুখ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। সে যে কি কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে জানে, তাই সেদিন সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার সাড়াশব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। কুটুম্ব-ভোজনের সময়েও সে উপস্থিত রহিল না। ভবানী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, বড়বাবু জরুরি তাগাদায় বাহির হইয়া গিয়াছেন; কখন আসিবেন কাহাকেও বলিয়া যান নাই। নিমাই রায় কর্মকর্তা সাজিয়া আদর-আপ্যায়ন কাহাকেও কম করিলেন না। বাহিরের নিমন্ত্রিত যে কয়জন আসিয়াছিলেন, বিনোদ তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল।

ঝড়ের পূর্বে নিরানন্দ প্রকৃতি যেরূপ স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করে, অনেক লোকজন সত্ত্বেও সমস্ত বাড়িটা সেইরূপ অশুভ ভাব ধরিয়া রহিল।

বিশেষ কোন হেতু না জানিয়াও চাকর-দাসীরা কেমন যেন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি করিয়া আরও দুইদিন কাটিল। যাঁহারা শ্রাদ্ধোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে বিদায় লইলেন। পিসিমা তাঁহার ছেলেমেয়ে লইয়া বর্ধমানে চলিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার বাহিরে বসিবার ঘরে বসিয়াই, সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটাইয়া দেয়—কাহারো সহিত বাক্যালাপ করে না। ভিতরে ভবানী একেবারেই নির্বাক্ হইয়া গিয়াছেন। গোকুল পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়— ভিতরে বাহিরে কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না—এমনভাবেও তিন-চারদিন অতিবাহিত হইল। মনোরমা এবং তাঁহার পুত্রকন্যা ছাড়া এ বাড়িতে আর যেন কোন মানুষ নাই।

নিমাই রায় তাঁহার কলিকাতার সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেদিন সকালবেলা, বোধ করি বা কুণ্ডুদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াই, মেয়ে-জামাইকে কূলে তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আজ সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি

আসিয়াছিল। আগমনের হেতুটা যদিচ তখনও পরিষ্কার হয় নাই, কিন্তু সে যে তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতিকে শুধু দেখিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আসে নাই, সেটুকু বুঝা গিয়াছিল। এ কয়দিন অতিপ্রাজ্ঞ শ্বশুরের সবল উৎসাহের অভাবে গোকুল যেরূপ ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, আজ তাহারও সে ভাব ছিল না। মনোরমার ত কথাই নাই। সকাল হইতে সমস্ত বাড়িটা সে যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মনোরমার ঘরের মধ্যেই ইহাদের বৈঠক বসিল; এবং অল্পকালের বাদানুবাদেই সমস্ত স্থির হইয়া গেল। আজ চক্রবর্তীর তলব হইয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিবার পূর্বে সমস্ত কাগজপত্র নিমাই তন্নতন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। একান্ত পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে সে বেচারা না পারে সব কথার জবাব দিতে, না পারে ঠিকমত হিসাব বুঝাইতে। ক্রমাগতই সে ধমক খাইতেছিল এবং বাপ-ব্যাটার কড়া জেরার চোটে, সে যে একজন পাকা চোর ইহাই নিজেকে প্রতিপন্ন করিতেছিল।

নিমাই কহিলেন, আমি ছিলাম না, তাই অনেক টাকাই তুমি আমার খেয়েচ, কিন্তু আর না, যাও তোমাকে জবাব দিলুম।

চক্রবর্তীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; কহিল, বাবু, আমি আজকের চাকর নই, কর্তামশাই আমাকে জানতেন।

গোকুল ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রায়মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুখ খিঁচাইয়া কহিল, তোমার কর্তামশায়ের মত কি বাবাকে গরু পেয়েচ, হ্যাঁ? আর মায়া বাড়াতে হবে না; সরে পড়।

এই নাবালক শ্যালকের একান্ত অভদ্র তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া চক্রবর্তী চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গোকুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বাবু, আমার চার মাসের মাইনে—

গোকুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে ত আছেই চক্কোত্তিমশাই, আরও যদি—

কথাটা শেষ হইল না। নিমাই ডান হাত প্রসারিত করিয়া গোকুলকে থামাইয়া দিয়া জলদগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, তুমি থাম না বাবাজী। চক্রবর্তীকে কহিলেন, বাবু উনি নয়, বাবু আমি! আমি যা করব, তাই হবে। মাহিনে তুমি পাবে না। তোমাকে যে জেলে দিচ্চিনে, এই তোমার বাপের ভাগ্যি বলে মানো।

চক্রবর্তী দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল।

মনোরমা এতক্ষণ কথা কহিতে না পাইয়া ফুলিতেছিল। সে যাইবামাত্রই মুখখানা গম্ভীর করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কণ্ঠস্বরে আব্‌দার মাখাইয়া দিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, ফের যদি তুমি বাবার কথায় কথা কবে—আমি হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরব, না হয় সব্বাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।

গোকুল জবাব দিল না, নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে স্বামীর এই একান্ত বাধ্যতায় সুখে গর্বে গলিয়া গিয়া মনোরমা আধ-আধ স্বরে কহিল, আচ্ছা বাবা, আমাদের নন্দলালকে কেন দোকানের একটা কাজে লাগিয়ে দাও না?

নিমাই বলিলেন, তাই ত ছোঁড়াটাকে সঙ্গে আনলুম মা। আমি ত আর বেশী দিন এখানে থাকতে পারব না; আমাদের নিজেদের চালানি কাজটা তা হলে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কি আসবার জো ছিল মা, বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেচি। তিনি প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, রায়মশাই, তুমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে থাকবে। দিবারাত্রি তোমার পথ চেয়ে বসেই আমার দিন যাবে। তাই মনে করচি মা, আমার নন্দলালকেই দেখিয়ে-শুনিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে যাব। আর যাই হোক, ও আমারই ত ছেলে!

তাই করে যাও বাবা। আমি সেইজন্যেই ত—

হঠাৎ মনোরমা মাথাই আঁচল সবেগে টানিয়া দিয়া চুপ করিল। ঘরের সম্মুখে চক্রবর্তী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, বাবু, মা এসেছেন—

অকস্মাৎ মা আসিয়াছেন শুনিয়া গোকুল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আজ সাত-আট দিন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত নাই। কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী সহজ-কণ্ঠে ডাকিলেন, গোকুল!

গোকুল তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কেন মা?

ভবানী অন্তরালে থাকিয়াই তেমনই পরিষ্কার-কণ্ঠে কহিলেন, এ-সব পাগলামি করতে তোমাকে কে বললে? চক্রবর্তীমশাই অনেকদিনের লোক, তিনি যতদিন বাঁচবেন, আমি ততদিন তাঁকে বহাল রাখলুম। সিন্দুকের চাবি খাতাপত্র নিয়ে তাঁকে দোকানে যেতে দাও।

ঘরের মধ্যে বজ্রাঘাত হইলেও বোধকরি লোকে এত আশ্চর্য হইত না।

ভবানী একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর একটা কথা। বেয়াইমশাই দয়া করে এসেচেন—কুটুমের আদরে দু'দিন থাকুন; দেখুন-শুনুন; কিন্তু দোকানে আমার চুরি হচ্চে কি না হচ্চে, সে চিন্তা করবার তাঁর আবশ্যক নাই। চক্রবর্তীমশাই, আপনি দেরি করবেন না, যান। আমার ইচ্ছে নয়, বাইরের লোক দোকানে ঢুকে খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে। গোকুল চাবি দে, উনি যান। বলিয়া কাহারো উত্তরের জন্য তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন, ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়া গেলে, নিমাই রায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, একেই বলে পরের ধনে পোদ্দারি। হুকুম দেবার ঘটাটা একবার দেখলে বাবাজী।

বাবাজী কিন্তু জবাব দিল না। জবাব দিল তাঁহার নিজের পুত্ররত্নটি। সে কহিল, এ ত জানা কথাই বাবা, তুমি থাকলে ত আর চুরি চলবে না! বলিহারি হুকুমকে!

পিতা সায় দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই বটে! এবং চক্রবর্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে স্যাঙ্গাত, বিদায় হও না! আবার ডেকে আনা হয়েচে? নেমকহারাম। জেলে দিলুম

না কিনা, তাই। দূর হও সুমুখ থেকে। বামুন বলে মনে করেছিলুম—যাক মরুক গে; যা করেচে তা করেচে; না হয় দু-পাঁচ টাকা দিয়ে দেব—কিন্তু আবার! তোমাকে শ্রীঘরে পোরাই কর্তব্য ছিল আমার।

কিন্তু মনোরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কথাটি কহিতে সাহস করিল না। গোকুল সেই যে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঠিক তেমনি করিয়া একভাবে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

চক্রবর্তী কাহারও কোন কথার জবাব না দিয়া প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া নম্রস্বরে কহিল, তা হলে খাতাপত্রগুলো আমি নিয়ে চললুম। সিন্দুকের চাবিটা দিন।

গোকুল বিনাবাক্যব্যয়ে কোমর হইতে চাবির তোড়াটা চক্রবর্তীর পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্তী চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া, খাতা বগলে পুরিয়া, হাসি চাপিয়া হেলিয়া-দুলিয়া প্রস্থান করিল। তাহার এই প্রস্থানের অর্থ যথেষ্ট প্রাঞ্জল। সুতরাং কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই, বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের কালো মুখের উপর কে যেন সংসারের সমস্ত কালি ঢালিয়া দিয়া গেল।

অতঃপর এই মন্ত্রণাগৃহের মধ্যে যে দৃশ্যটি ঘটিল, তাহা সত্যই অনির্বচনীয়। পিতা ও ভ্রাতার এই অচিন্তনীয় বিকট লাঞ্ছনায় মনোরমা জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বামীর প্রতি উৎকট তিরস্কার, গঞ্জনা, সর্বপ্রকার বিভীষিকা-প্রদর্শন, অনুনয়-বিনয় এবং পরিশেষে মর্মান্তিক বিলাপ করিয়াও যখন তাঁহার মুখ হইতে পিতার স্বপক্ষে একটা কথাও বাহির করিতে পারিল না, তখন সে মুখ গুঁজিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল।

গোকুল লজ্জায় ক্ষোভে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা যে শত্রুতা করে এমন হুকুম দেবেন, সে আমি কি করে জানব?

নিমাই একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল। একটা মস্ত ঝঞ্ঝাটের হাত এড়ালুম। ওদিকে শিবতুল্য মনিব আমার কাঁদা-কাটা

করচেন—আমার কি কোথাও থাকবার জো আছে। তা ছাড়া, দরকার কি আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে! কিন্তু মা মনু, ছেলেপিলের হাত ধরে যদি পথে দাঁড়াও—সে ত দাঁড়াতেই হবে, চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি—তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না যে, বাবা একবাব ফিরেও তাকালে না। সে বাবা আমি নই, তা বলে যাচ্চি—তা মেয়েই হও আর জামাতাই হও। বলিয়া তিনি জামাতার প্রতিই একটা তীব্র বক্র কটাক্ষ করিলেন। কিন্তু সে কটাক্ষ ছেলে ছাড়া আর কাহারও কাজে লাগিল না। তিনি তখন আবার প্রদীপ্ত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এখনো বেঁকে বসেনি বটে, কিন্তু বেঁকলে নিমাই রায় কারু নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও অসাধ্য—তা তোমরা দু'জনে একবার গোপনে ভেবে দেখো। বাবা নন্দলাল, আড়াইটে বেজেছে, সাড়ে-তিনটের গাড়িতে আমি যাব। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—জানো ত তোমার বাপের কথার নড়চড় পৃথিবী উলটে গেলেও হবার জো নেই। বলিয়া তিনি সদর্পে ছেলের হাত ধরিয়া মেয়ে-জামাইকে ভাবিবার একঘন্টা মাত্র সময় দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোন কাজই হইল না। একঘণ্টা অতি অল্প সময়—তিনদিন পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া, অবিশ্রাম মান-অভিমান রাগারাগি এবং কটূক্তি করিয়াও গোকুলের মুখ হইতে দ্বিতীয় কথা বাহির করা গেল না। শ্বশুরের এই অত্যন্ত অপমানে তাহার নিজেরই লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মায়ের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে সে যে কি করিবে তাহা কোনদিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়াই, সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

এগার

নিমাই যখন দেখিল তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন সে ভীষণ হইয়া উঠিল এবং স্পষ্ট শাসাইয়া দিতে বাধ্য হইল যে তাঁহাকে চাকরি ছাড়াইয়া আনার দরুন ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তিনি বাঁড়ুয্যেমশাইকে ইতিমধ্যে হাত করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া গোকুলকে নির্বোধ বলিয়া, অন্ধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এমন একটা ভয়ানক ইঙ্গিত করিলেন যাহাতে বুঝা গেল, নিমাই রায়কে অপমান করিলে সে বিনোদকে গিয়াও সাহায্য করিতে পারে।

গোকুল কাতরকণ্ঠে কহিল, কি করব মাস্টারমশাই, মা যে তাকে বাড়িতে রাখতেই চান না। চক্রবর্তীমশাইকে হুকুম দিয়েচেন দোকানে পর্যন্ত যেন তিনি না ঢোকেন।

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন, কারবার, বিষয়-আশয় তোমার না তোমার মায়ের, গোকুল? তা ছাড়া, তোমার বিমাতা এখন তোমার শত্রুপক্ষে, সে সংবাদ রেখেচ ত?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে বাঁড়ুয্যেমশাই খুশি হইয়া বলিলেন, তবে পাগলামি করো না ভায়া; রায়মশাইকে বিষয়-আশয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বুঝিয়ে, চুপটি করে বসে বসে শুধু মজা দেখ। আমার কথা ছেড়ে দাও, নইলে অমন পাকা লোক একটি এ-তল্লাটে খুঁজলে পাবে না।

গোকুল কহিল, সে ত জানি মাস্টারমশাই; কিন্তু মায়ের অমতে কোন কাজ করতে বাবা নিষেধ করে গেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ! মা যে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সে কি তোমার বাবা জেনে গিয়েছিলেন? নিষেধ করলেই ত

হ'লো না। নিষেধ শুনতে গিয়ে কি বিষয়টি খোয়াবে? তা বল? গোকুলের তরফে এ-সকল প্রশ্নের জবাব ছিল না; তাই সে ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রায়মশাই নেপথ্যে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। এবার সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই দুইজন মহারথীর সমবেত জেরার মুখে গোকুল অকূলে ভাসিয়া গেল। তাহাকে অধোবদন এবং নিরুত্তর দেখিয়া উভয়েই প্রীত হইলেন এবং তাহার এই সুবুদ্ধির জন্য তাহাকে বারংবার প্রশংসা করিলেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলেন, সফল-মনোরথ রায়মশাই আজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তিনি সস্নেহে গোকুলের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, আমি আশীর্বাদ করচি গোকুল, তুমি যেমন তোমার যথাসর্বস্ব আমাদের হাতে সঁপে দিলে—তোমার তেমনি গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত আমরা লাগতে দেব না। কি বল রায়মশাই?

রায়মশাই আনন্দে বিনয়ে গদ্‌গদ হইয়া কহিলেন, আপনার আশীর্বাদে সে দেশের পাঁচজন দেখতেই পাবে। কিন্তু শত্রুদের আর আমি এ-বাড়িতে একটি দিনও থাকতে দেব না, তা আপনাকে জানিয়ে দিচ্চি বাঁড়ুয্যেমশাই। তা তাঁরা আমার বাবাজীর মা-ই হোন, আর ভাই-ই হোন। আর সেই ব্যাটা চক্কোত্তিকে আমি তাড়িয়ে তবে জলগ্রহন করব। কে আছিস রে ওখানে? ব্যাটা বামুনকে ডেকে আন্ দোকান থেকে। বলিয়া রায়মশাই ইহারই মধ্যে ষোল আনা ছাপাইয়া সতর আনার মত একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন।

গোকুল সঙ্কুচিত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, না না, এখন তাঁকে ডাকবার আবশ্যক নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, গোকুল, এ-সব চক্ষুলজ্জার কাজ নয়। তাকে আমরা রাখতে পারব না—কোনমতেই না। তার বড় আস্পর্ধা। আমরা তাকে চাইনে তা বলে দিচ্চি।

প্রত্যুত্তরে গোকুল তেমনি বিনীত-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু মা তাঁকে চান। তিনি যাঁকে বাহাল করচেন তাঁকে ছাড়িয়ে দেবার সাধ্য কারুর নেই। বাবা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে যাননি। বলিয়া গোকুল পুনরায় মুখ হেঁট করিল। তাহার এই একান্ত অপ্রত্যাশিত উত্তর, এই শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই কহিলেন, তা হলে সে থাকবে বল?

গোকুল কহিল, আজ্ঞে হাঁ। চক্কোত্তিমশায়ের উপর আমার আর কোন হাত নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই ভয়ে বলিলেন, তা হলে রায়মশায়ের কি-রকম হবে?

গোকুল কহিল, উনি বাড়ি যান। মা কোনমতেই ওঁকে এখানে রাখতে চান না। আর চাকরি ছাড়ায় ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়ে দেব। বলিয়া কাহারও উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া প্রস্থান করিল।

সবাই মনে করিয়াছিল, এতবড় অপমানের পর রায়মশাই আর তিলার্ধ অবস্থান করিবেন না। কিন্তু আট-দশদিন কাটিয়া গেল—এই মনে করার বিশেষ কোন মূল্য দেখা গেল না। বোধ করি বা কন্যা-জামাতার প্রতি অসাধারণ মমতাবশতঃই তিনি ছোট কথা কানে তুলিলেন না এবং সরেজমিনে উপস্থিত থাকিয়া অহর্নিশ তাহাদের হিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই হিতাকাঙ্ক্ষার প্রবল দাপটে একদিকে গোকুল নিজে যেমন পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল, ওদিকে বাটীর মধ্যে ভবানীও তেমনি প্রতি মুহূর্তেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বধূ ও তাহার পিতার পরিত্যক্ত শব্দভেদী বাণ খাইতে-শুইতে-বসিতে তাঁহার দুই কানের মধ্যে দিয়া অবিশ্রাম বুকে বিঁধিতে লাগিল।

সেদিন তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, বৌমা, গোকুল কি চায় না যে, আমি বাড়িতে থাকি?

বৌমা জবাব ইচ্ছা করিয়াই দিল না—মাথা হেঁট করিয়া নখের কোণ খুঁটিতে লাগিল।

ভবানী কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিলেন, বেশ, তাই যদি তার ইচ্ছে, সে নিজে এসে স্পষ্ট করে বলে না কেন? এমন করে তোমার ভাইকে দিয়ে, তোমার বাপকে দিয়ে আমাকে দিবারাত্রি অপমান করাচ্ছে কেন?

অথচ গোকুল যে ইহার বাষ্পও না জানিতে পারে, এমন কি তাহাকে সম্পূর্ণ গোপন করিয়াই যে এই ক্ষুদ্রাশয়েরা তাহাদের বিষদন্ত বাহির করিয়া দংশন করিয়া ফিরিতেছিল, এ কথা ভবানীর একবারও মনেও হইল না। কিন্তু বধূ ত আর সে বধূ নাই। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, অপমান কে কাকে করেচে, সে কথা দেশসুদ্ধ লোক জানে। আমার নিজের জিনিস যদি আমি চোরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমার বাপ-ভাইকে তুলে দিতে যাই, তাতে তোমার বুকে শূল বেঁধে কেন মা? আর একজনের জন্যে আর-একজনের সর্বনাশ করাটাই কি ভালো?

ভবানী আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, আমি কার সর্বনাশ করেচি মা?

বধূ কহিল, যাদের করেচ তারাই গাল দিচ্চে। এতে তিনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা করব কি! ইঁট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—তাতে রাগ করলে ত চলে না মা। বলিয়া বধূ চলিয়া গেল।

ভবানী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁহার সেই গোকুল এবং সেই গোকুলের স্ত্রীর কথা মনে করিয়া, অনেকদিন পর আজ আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আজ আর কোন মতেই মন হইতে এ অনুশোচনা দূর করিতে পারিলেন না যে, নির্বোধ তিনি শুধু নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করেন নাই, ছেলের পায়েও করিয়াছেন। অমন করিয়া যাচিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য গোকুলকে

লিখাইয়া না দিলে ত আজ এ দুর্দশা ঘটিত না। বিনোদ যত মন্দই হোক, কিছুতেই সে জননীকে এমন করিয়া অপমান ও নির্যাতন করিতে পারিত না।

কিন্তু বিনোদ যে গোপনে উপার্জনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কেহ জানিত না। সে আদালতে একটা চাকরি যোগাড় করিয়া লইয়া এবং শহরের একপ্রান্তে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া, সন্ধ্যার পর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাল সকালেই সে তাহার নূতন বাসায় যাইবে।

ভবানী আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, বিনোদ, আমাকেও নিয়ে চল্ বাবা, এ অপমান আমি আর সইতে পারিনে। তুই যেমন করে রাখবি, আমি তেমনি করে থাকব; কিন্তু এ বাড়ি থেকে আমাকে মুক্ত করে দে। বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তার পর একটি একটি করিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া লইয়া বিনোদ বাহিরে যাইতেছিল, পথে গোকুলের সহিত দেখা হইল। সে দোকানের কাজকর্ম সারিয়া ঘরে আসিতেছিল। অন্যদিন এ অবস্থায় বিনোদ দূর হইতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইত, আজ দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ কাছে আসিয়া কহিল, কাল সকালেই মাকে নিয়ে আমি নূতন বাসায় যাব।

গোকুল অবাক হইয়া কহিল, নূতন বাসায়? আমাকে না জিজ্ঞেসা করেই বাসা করা হয়েচে নাকি?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

এম. এ. পড়া তা হলে ছাড়লে বল?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

সংবাদটা গোকুলকে যে কিরূপ মর্মান্তিক আঘাত করিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বিনোদ তাহা দেখিতে পাইল না। ছোটভাইয়ের এই এম. এ. পাশের স্বপ্ন সে শিশুকাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে। পরিচিতের মধ্যে যেখানে যে-কেহ কোন-একটা পাশ করিয়াছে—খবর পাইলেই গোকুল উপযাচক হইয়া সেখানে গিয়া

হাজির হইত এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া শেষে এম. এ. পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার জন্য নিজের অত্যন্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। ব্যাপারটা যাহারা জানিত, তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিত। যাহারা জানিত না, তাহারা উদ্বেগের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেই 'আমার ছোটভাই বিনোদের অনার গ্রাজুয়েটে'র কথাটা উঠিয়া পড়িত। তখন কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া বিনোদের সোনার মেডেলটাও বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু কি করিয়া যে মখমলের বাক্সসুদ্ধ জিনিসটা গোকুলের পকেটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হেতুই সে স্মরণ করিতে পারিত না। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল সেকরা ডাকাইয়া এই দুর্লভ বস্তুটি সে নিজের ঘড়ির চেনের সঙ্গে জুড়িয়া লয় এবং এতদিনে তাহা সমাধা হইয়াও যাইত—যদি না বিনোদ ভয় দেখাইত—এরূপ পাগলামি করিলে সে সমস্ত টান মারিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবে। গোকুল উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, এম. এ.-র মেডেলটা না-জানি কিরূপ দেখিতে হইবে এবং এ বস্তু ঘরে আসিলে কোথায় কিভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

এ-হেন এম. এ. পাশের পড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল শুনিয়া গোকুলের বুকে তপ্ত শেল বিঁধিল। কিন্তু আজ সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া কহিল, তা বেশ কিন্তু মাকে নূতন বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি শুনি?

সে দেখা যাবে। বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেল। সে নিজেও মায়ের মত অল্পভাষী; যে-সকল কথা সে এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই দাদার কাছে প্রকাশ করিল না।

গোকুল বাড়ির ভিতরে পা দিতে না দিতেই, হাবুর মা সংবাদ দিল, মা একবার ডেকেছিলেন। গোকুল সোজা মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি এমন সন্ধ্যার সময়েও নির্জীবের মত শয্যায় পড়িয়া আছেন। ভবানী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, গোকুল, কাল সকালেই আমি এ বাড়ি থেকে যাচ্ছি।

সে এইমাত্র বিনোদের কাছে শুনিয়া মনে মনে জ্বলিয়া যাইতেছিল; তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমার পায়ে ত আমরা কেউ দড়ি দিয়ে রাখিনি মা। যেখানে খুশি যাও, আমাদের তাতে কি? গেলেই বাঁচি। বলিয়া গোকুল মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলায় ভবানী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, হাবুর মা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। গোকুল উঠানের উপর দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, হাবুর মা, আজ ওঁর যাওয়া হতে পারে না, বলে দে।

হাবুর মা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বড়বাবু?

গোকুল কহিল, আজ দশমী না? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, আজ গেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয়। আজ আমি কিছুতেই বাড়ি থেকে যেতে দিতে পারব না, বলে দে। ইচ্ছা হয় কাল যাবেন—আমি গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েচি। বলিয়া গোকুল দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছিল, মনোরমা হাত নাড়িয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া তর্জন করিয়া কহিল, যাচ্ছিলেন, আটকাতে গেলে কেন?

এ-কয়দিন স্ত্রীর সহিত গোকুলের বেশ বনিবনাও হইতেছিল। আজ সে অকস্মাৎ মুখ ভেঙ্গাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আটকালুম আমার খুশি। বাড়ির গিন্নী, অদিনে, অক্ষণে বাড়ি থেকে গেলে ছেলেপিলেগুলো পটপট করে মরে যাবে না? বলিয়া তেমনি দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

রকম দ্যাখো! বলিয়া মনোরমা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল।

বার

দশমীর পর একাদশী গেল, দ্বাদশীও গেল, মাকে পাঠাইবার মত তিথি-নক্ষত্র গোকুলের চোখে পড়িল না। ত্রয়োদশীর দিন বাটীর পুরোহিত নিজে আসিয়া সুদিনের সংবাদ দিবামাত্র গোকুল অকারণে গরম হইয়া কহিল, তুমি যার খাবে, তারই সর্বনাশ করবে? যাও, নিজের কাজে যাও, আমি মাকে কোথাও যেতে দিতে পারব না।

মনোরমা সেদিন ধমক খাইয়া অবধি নিজে কিছু বলিত না, আজ সে তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দিল।

নিমাই আসিয়া কহিল, এটা ত ভাল কাজ হচ্ছে না বাবাজী!

গোকুল কোনদিন খবরের কাগজ পড়ে না, কিন্তু আজ পড়িতে বসিয়াছিল।

কহিল, কোন্‌টা?

বেয়ানঠাকরুন তাঁর নিজের ছেলের বাসায় যখন স্ব-ইচ্ছায় যেতে চাচ্ছেন, তখন আমাদের বাধা দেওয়া ত উচিত হয় না।

গোকুল পড়িতে পড়িতে কহিল, পাড়ার লোক শুনলে আমার অখ্যাতি করবে।

নিমাই অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, অখ্যাতি করবার আমি ত কোন কারণ দেখতে পাইনে।

গোকুল শ্বশুরকে এতদিন মান্য করিয়াই কথা কহিত। আজ হঠাৎ আগুন হইয়া কহিল, আপনার দেখবার ত কোন প্রয়োজন দেখিনে। আমার মাকে আমি কারু কাছে পাঠাব না—বাস্, সাফ কথা! যে যা পারে আমার করুক।

গোকুলের এই সাফ কথাটা বিনোদের কানে গিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। প্রত্যহ বাধা দিয়া গাড়ি ফেরত দেওয়ায় সে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। আজ অত্যন্ত রাগিয়া আসিয়া কহিল, দাদা, মাকে আমি আজ নিয়ে যাব। আপনি অনর্থক বাধা দেবেন না।

গোকুল সংবাদপত্রে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া কহিল, আজকে ত হতে পারবে না।

বিনোদ কহিল, খুব পারবে। আমি এখুনি নিয়ে যাচ্ছি।

তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোকুল হাতের কাগজটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যাচ্ছি বললেই কি হবে? বাবা মরবার সময় মাকে আমায় দিয়ে গেছেন—তোমাকে দেননি। আমি কোথাও পাঠাব না।

বিনোদ কহিল, সে ভার যদি আপনি বাস্তবিক নিতেন দাদা, তা হলে এমন করে মাকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা অপমান ভোগ করতে হ'ত না। মা, বেরিয়ে এসো, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বলিয়া বিনোদ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই ভবানী বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যে অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা গোকুল জানিত না। তাঁহাকে সোজা গিয়া গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া গোকুল আড়ষ্ট হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পিছনে পিছনে গাড়ির কাছে আসিয়া কহিল, এমন জোর করে চলে গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা বলে দিচ্চি মা।

ভবানী জবাব দিলেন না। বিনোদ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ করিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিতেই গোকুল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নয়? আমাকে তোমার মানুষ করতে হয়নি?

গাড়ির চাকার শব্দে সে কথা ভবানীর কানে গেল না, কিন্তু বিনোদের কানে গেল। সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গোকুল কোঁচার খুঁটে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং ভিতরে ঢুকিয়া সে বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার এই ব্যবহারে অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া নিমাই কিছু উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন, কিন্তু খানিক পরে সে যখন দ্বার খুলিয়া বাহির হইল এবং যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া দোকানে চলিয়া গেল, তখন তাহার চোখে-মুখে এবং আচরণে বিশেষ কোন ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং নির্বিঘ্ন হইয়া তিনি এইবার নিজের কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ সাপ যেমন করিয়া তাহার শিকার ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ঠিক তেমনি করিয়া তিনি জামাতাকে মহা-আনন্দে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষণও বেশ অনুকূল বলিয়াই মনে হইল। গোকুল পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অত্যন্ত উগ্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য কারণেই বিদ্রোহ করিত; কিন্তু যেদিন ভবানী চলিয়া গেলেন, সেইদিন হইতে সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেল। কাহারও কোন কথায় রাগ করিত না, প্রতিবাদও করিত না। ইহাতে নিমাই যত পুলকিতই হউন, তাঁহার কন্যা খুশি হইতে পারিল না। গোকুলকে সে চিনিত। সে যখন দেখিল স্বামী খাওয়া-দাওয়া লইয়া হাঙ্গামা করে না, যা পায় নীরবে খাইয়া উঠিয়া যায়, তখন সে ভয় পাইল। এই জিনিসটাতেই গোকুলের ছেলেবেলা হইতেই একটু বিশেষ শখ ছিল। খাইতে এবং খাওয়াইতে সে ভালবাসিত। প্রতি রবিবারেই সে বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এ রবিবার তাহার কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া মনোরমা প্রশ্ন করিল।

গোকুল উদাসভাবে জবাব দিল, সে-সব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছে, রেঁধে খাওয়াবে কে? মনোরমা অভিমানভরে কহিল, রাঁধতে কি শুধু মা-ই শিখেছিলেন—আমরা শিখিনি? গোকুল কহিল, সে তোমার বাপ-ভাইকে খাইয়ো, আমার দরকার নেই।

মনোরমার মা কালীঘাটের ফেরত একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৎ-শাশুড়ি রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মেয়ের ভাঙ্গা সংসার গুছান আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি দুই-চারিদিন থাকিয়া যাইতেই মনস্থ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিকল সংসার মেরামত হইয়া আবার সুন্দর চলিতে লাগিল; এবং কর্ণধার হইয়া দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাড়ার লোকেরা প্রথমে কথাটা লইয়া আন্দোলন করিল, কিন্তু কলিকালের স্বধর্মে দুই-চারিদিনেই নিরস্ত হইল।

হাবুর মার ঘর এই পথে। সে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া যাইত। তার মুখে ভবানী গোকুলের নূতন সংসারের কাহিনী শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভালোমন্দ কোন কথা কহিলেন না।

সেদিন আসিবার সময় সেই যে গোকুল গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, তাঁহাদের সমস্ত সম্বন্ধের এই শেষ, তখন নিজের অভিমানের কথাটা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু একমাসকাল যখন কাটিয়া গেল, গোকুল তাঁহার সংবাদ লইল না, তখন তিনি মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সে যে সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিবে, ছোটভাইকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে, এত কাণ্ড, এত রাগারাগির পরেও সে-কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই আজ হাবুর মার মুখে ঘরের মধ্যে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার বার্তা পাইয়া তিনি শুধু স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন।

নূতন বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন মাত্র বিনোদ সংযত ছিল, তার পরেই সে স্বরূপ প্রকাশ করিল। মায়ের কোন তত্ত্বই প্রায় সে লইত না; রাত্রে বাড়িতে থাকিত না; সকালে যখন ঘরে আসিত, তখন দুঃখে লজ্জায় ভবানী তাহার প্রতি চাহিতে পারিতেন না।

এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, সে চাকরি করে। কিন্তু কি চাকরি, কত মাহিনা, কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এখন এইটাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, আর যাই হোক, তিনি ছেলেকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত হইয়া অন্যায় করেন নাই; কারণ গোকুল স্ত্রী-শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রভাবে তাঁহাদের প্রতি যত অন্যায়ই করুক, সে স্বামীর এত দুঃখের দোকানটি অন্ততঃ বজায় করিয়া রাখিবে, স্বর্গীয় স্বামীর কথা মনে করিয়া তিনি এ চিন্তাতেও কতকটা সুখ পাইতেন। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল।

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। প্রতি বৎসর এইদিনে ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেন। কিন্তু এবার নিজের কাছে টাকা না থাকায় এবং কথা-প্রসঙ্গে বিনোদকে বার-দুই জানাইয়াও তাহার কাছে সাড়া না পাওয়ায় এ বৎসর ভবানী সে সঙ্কল্পই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সহসা অতি প্রত্যূষে ভয়ানক ডাকাডাকি, হাবুর মা সদর দরজা খুলিয়া দিতেই গোকুল ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার অনেক লোক, ঘি, ময়দা, বহুপ্রকার মিষ্টান্ন, ঝুড়িভরা পাকা আম। ঢুকিয়াই কহিল, আমাদের পাড়ার সমস্ত বামুনদের নেমন্তন্ন করে এসেচি— সে বাঁদরটার পিত্যেশে ত আর ফেলে রাখতে পারিনে। মা কই? এখনো ওঠেন নি বুঝি? যাই, কাজকর্ম করবার লোকজন গিয়ে

পাঠিয়ে দিই গে? যেমন মা—তেমনি ব্যাটা, কারো চাড়ই নেই, যেন আমারই বড় মাথাব্যথা! মাকে খবর দি গে হাবুর মা, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসচি। বলিয়া গোকুল যেমন ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভবানী অনেকক্ষণ উঠিয়াছিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। গোকুল চলিয়া যাইবামাত্র অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা আসিয়া তাঁহার দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া গেল। সেদিন ছিল রবিবার। ‘শনিবারের রাত্রি’ করিয়া অনেক বেলায় বিনোদ বাড়ি ঢুকিয়া অবাক হইয়া গেল! হাবুর মার কাছে সমস্ত

অবগত হইয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দাদাকে খবর দিয়ে এর মধ্যে না এনে আমাকে জানালেই ত হ'তো। আমার যে এতে অপমান হয়।

ভবানী সমস্ত বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন।

গোকুল ফিরিয়া আসিয়া বিনোদকে দেখিয়াও দেখিল না। কাজকর্মের তদারক করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাধা হইয়া গেলে, কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে সকলের মধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ব'সো।

আজ তিনিও গোকুলের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই তাহারই টাকায় পরিতোষপূর্বক আহার করিয়া সেদিনের অপমানের শোধ তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মজুমদারদের অনেক অন্নই নাকি তিনি হজম করিয়াছিলেন, তাই নিমাই রায়ের দরুন সেদিনের লাঞ্ছনাটা তাঁহাকেই বেশী বাজিয়াছিল। সর্বসমক্ষে বিনোদকে উদ্দেশ করিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, বলি ভায়া, দাদার আজকের চালটা টের পেয়েচ ত?

কথার ধরনে গোকুল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

বিনোদ সংক্ষেপে কহিল, না।

বাঁড়ুয্যেমশাই মৃদু-গম্ভীর হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই দেখচি মকদ্দমা জিতেচ! বি. এ., এম. এ. পাশ করলে ভাই, আর এটা ঠাওর হ'লো না যে, মাকে হাত করাটাই হচ্চে যে আজকের চাল। তাঁর ওপরই যে মকদ্দমা!

গোকুল চোখমুখ কালিবর্ণ করিয়া—কখ্খনো না মাস্টারমশাই, কখ্‌খনো না! বলিতে বলিতে বেগে প্রস্থান করিল।

বাঁড়ুয্যেমশাই চেঁচাইয়া বলিলেন, এখানে ঢুকতে দিয়ো না ভায়া, সর্বনাশ করে তোমার ছাড়বে।

এ কথাটাও গোকুলের কানে পৌঁছিল।

বিনোদ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। দাদাকে সে যে না চিনিত, তাহা নয়। একটা উদ্দেশ্য লইয়া আর একটা কাজ করা যে তাহার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব, তাহাও সে জানিত। তাই বাঁডুয্যের কথাগুলো শুধু যে সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল তাহা নয়, এত লোকের সমক্ষে দাদার এই অপমান তাহাকে অত্যন্ত বিঁধিল।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হইলে বিনোদ ভিতরে গিয়া দেখিল—মা ঘরে দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন । কথাটা যে তাঁর কানে গিয়াছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিনোদ টের পাইল।

দোকানের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পর গোকুল নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—সেখানেও একটা বিরাট মুখভারীর অভিনয় চলিতেছে। স্বয়ং রায়মশাই খাটের উপর বসিয়া মুখখানা অতি বিশ্রী করিয়া বসিয়া আছেন এবং নীচে মেঝের উপর বসিয়া তাঁহার কন্যা, হিমুকে কাছে লইয়া, পিতৃ-মুখের অনুকরণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই রায়মশাই কহিলেন, বাবাজী, নির্বোধের মত তুমি এই যে আমাদের আজ তোমার মাকে দিয়ে অপমান করালে, তার প্রতিকার কি বল?

একে গোকুলের যারপরনাই মন খারাপ হইয়াছিল, তাহাতে সারাদিনের পরিশ্রমে অতিশয় শ্রান্ত। অভিযোগের ধরনটায় তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

মনোরমা ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিয়া কহিল, আর যদি কোনদিন তুমি ওখানে যাও—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

মেয়ের উৎসাহ পাইয়া রায়মশাই অধিকতর গম্ভীরভাবে কহিলেন, সে মাগী কি সোজা—

গোকুল বোমার মত ফাটিয়া উঠিল—চোপরাও বলচি। আমার মায়ের নামে ওরকম কথা কইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব। বলিয়া নিজেই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

রায়মশায় ও তাঁহার কন্যা বজ্রাহতের ন্যায় পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। গোকুল এ কি করিল! পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়কে এ কি ভয়ঙ্কর অপমান করিয়া বসিল!

তের

বিনোদের বেশ একটি বন্ধুর দল জুটিয়াছিল যাহারা প্রতিনিয়তই তাহাকে মকদ্দমায় উৎসাহিত করিতেছিল। কারণ, হারিলে তাহাদের ক্ষতি নাই—জিতিলে পরম লাভ। অনেকদিনের অনেক আমোদ-প্রমোদের খোরাক সংগ্রহ হয়। আবার মকদ্দমা যে করিতেই হইবে, তাহাও একপ্রকার নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছিল। যেহেতু বিনোদের তরফ হইতে যে বন্ধুটি আপোসে মিটমাট করিবার প্রস্তাব লইয়া একদিন গোকুলের কাছে গিয়াছিল, গোকুল তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বয়াটে নচ্ছার পাজিকে এক সিকি-পয়সার বিষয় দেব না—যা পারে সে করুক।

কিন্তু এতবড় বিষয়ের জন্য মামলা রুজু করিতে একটু বেশী টাকার আবশ্যক। সেইটুকুর জন্যই বিনোদের কালবিলম্ব হইয়া যাইতেছিল।

দাদার উপর বিনোদের যত রাগই থাকুক, সেইদিন হইতেই কেমন যেন তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। অত লোকের সম্মুখে অপমানিত হইয়া যেমন করিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, তাহার মুখের সে আর্ত ছবিটা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। বুকের ভিতরে কে যেন অনুক্ষণ বলিতেছিল—অন্যায়, অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদে অভিহিত করিয়া দাদাকে বিদায় করা হইয়াছে। সেই দাদা যে জীবনে কোনদিন এ পথ মাড়াইবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বিনোদ বুঝিয়াছিল।

দেশের কৃতবিদ্য যুবকদিগের অনেকেই বিনোদের বন্ধু। সকলেরই পূর্ণ সহানুভূতি বিনোদের উপরে। সেদিন সকালে তাঁহারা বাহিরের ঘরে বসিয়া মাস্টারমশাইকে ডাকাইয়া আনিয়া অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির করিয়াছিলেন, কথার ফাঁদে গোকুলকে জড়াইতে না পারিলে সুবিধা নাই। গোকুল মূর্খ এবং অত্যন্ত নির্বোধ তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে উত্তেজিত করিয়া

তাহারই মুখের কথায় তাহাকেই জব্দ করিয়া সাক্ষীর সৃষ্টি করা কঠিন হইবে না। কথা ছিল, আগামী রবিবার সকালবেলায় দেশের দশজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া গোকুলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কথার ফেরে বাঁধিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে কত তামাশা, কত বিদ্রূপ অনুপস্থিত হতভাগ্য গোকুলের মাথায় বর্ষিত হইল; কে কি বলিবেন এবং করিবেন, সকলেই একে একে তাহার মহড়া দিলেন, শুধু বিনোদ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার উৎসাহের অভাব নিজেদের উৎসাহের বাহুল্যে কেহ লক্ষ্যই করিলেন না।

আজ বিনোদ কাজে বাহির হয় নাই, আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে বসিয়াছিল; বেলা একটার সময় হঠাৎ গোকুল—কৈ রে হাবুর মা, খাওয়া-দাওয়া চুকল? বলিয়া প্রবেশ করিল।

হাবুর মা শশব্যস্তে বড়বাবুকে আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, না বড়বাবু এখনো শেষ হয়নি।

হয়নি? বলিয়া গোকুল নিজেই আসনটা তুলিয়া আনিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় পাতিল।

বসিয়া কহিল, এক গেলাস ঠান্ডা জল খাওয়া দিকি হাবুর মা। তাগাদায় বেরিয়ে এই রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে একেবারে হয়রান হয়ে গেছি। মা কৈ রে?

ভবানী রান্নাঘরেই ছিলেন। কিন্তু সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিপুল লজ্জায় হঠাৎ সম্মুখে আসিতেই পারিলেন না।

বিনোদ কাজে গিয়াছে, ঘরে নাই—গোকুল ইহাই জানিত | কহিল, সব মিথ্যে হাবুর মা, সব মিথ্যে। কলিকাল—আর কি ধর্ম-কর্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বললেন, বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা! আমি ভালমানুষ—নইলে বেন্দার বাপের সাধ্যি কি, সে মাকে আমার জোর করে নিয়ে আসে? কেন, আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি, এখনি জোর করে নিয়ে যেতে

পারিনে? বাবার এই হ'লো আসল উইল—তা জানিস হাবুর মা? শুধু দু'কলম লিখে দিলেই উইল হয় না।

হাবুর মা চোখ টিপিয়া ইঙ্গিতে জানাইল বিনোদ ঘরে আছে। গোকুল জলের গেলাসটা রাখিয়া দিয়া জুতা পায়ে দিয়া দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নটা-দশটার সময় হঠাৎ দোকানের চক্রবর্তী আসিয়া হাজির। জিজ্ঞাসা করিল, মা, বড়বাবু এখনো বাড়ি যাননি—এখান থেকে খেয়ে কখন গেলেন?

ভবানী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে ত এখানে খায়নি। তাগাদার পথে শুধু এক গেলাস জল খেয়ে চলে গেল।

চক্রবর্তী কহিল, এই নাও। আজ বড়বাবুর জন্মতিথি। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বলে এসেচে, মায়ের প্রসাদ পেতে যাচ্চি। তা হলে সারাদিন খাওয়াই হয়নি দেখচি।

শুনিয়া ভবানীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদ পাশের ঘরেই ছিল, চক্রবর্তীর সাড়া পাইয়া কাছে আসিয়া বসিল। তামাশা করিয়া কহিল, কি চক্রবর্তীমশাই, নিমাই রায়ের তাঁবে চাকরি হচ্চে কেমন?

চক্রবর্তী আশ্চর্য হইয়া কহিল, নিমাই রায়? রামঃ—সে কি দোকানে ঢুকতে পারে নাকি?

বিনোদ বলিল, শুনতে পাই দাদাকে সে গ্রাস করে বসে আছে?

চক্রবর্তী ভবানীকে দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, উনি বেঁচে থাকতে সেটি হবার জো নেই ছোটবাবু। আমাকে তাড়িয়ে সর্বস্বর মালিক হতেই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মায়ের একটা হুকুমে সব ফেঁসে গেল। এখন ঠকিয়ে-মজিয়ে ছ্যাঁচড়ামি করে যা দু'পয়সা আদায় হয়, দোকানে হাত দেবার জো নেই। বলিয়া চক্রবর্তী

সেদিনের সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, বড়বাবু একটুখানি বড্ড সোজা মানুষ কিনা, লোকের প্যাঁচ-স্যাঁচ ধরতে পারে না।

কিন্তু তা হলে কি হয়, পিতৃমাতৃভক্তি যে অচলা—সেই যে বললেন, মায়ের হুকুম রদ করবার আমার সাধ্যি নেই—তা এত কাঁদাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি—না, কিছুতে না | আমার বাপের হুকুম—মায়ের হুকুম! আমি যেমন কর্তা ছিলাম—তেমনি আছি ছোটবাবু।

বিনোদের দু'চক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল। চক্রবর্তী কহিতে লাগিল, এমন বড়ভাই কি কারু হয় ছোটবাবু? মুখে কেবল বিনোদ আর বিনোদ। আমার বিনোদের মত পাশ কেউ করেনি, আমার বিনোদের মত লেখাপড়া কেউ শেখেনি, আমার বিনোদের মত ভাই কারু জন্মায় নি। লোকে তোমার নামে কত অপবাদ দিয়েচে ছোটবাবু, আমার কাছে এসে হেসে বলেন, চক্কোত্তিমশাই, শালারা কেবল আমার ভায়ের হিংসে করে দুর্নাম রটায়। আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করব, আমাকে এমনি বোকাই ঠাউরেচে শালারা!

একটু থামিয়া কহিল, এই সেদিন কে এক কাশীর পণ্ডিত এসে তোমার মন ভাল করে দেবে বলে একশ-আট সোনার তুলসীপাতার দাম প্রায় পাঁচ শ টাকা বড়বাবুর কাছে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমি কত নিষেধ করলুম, কিছুতেই শুনলেন না; বললেন, আমার বিনোদের যদি সুমতি হয়, আমার বিনোদ যদি এম. এ. পাশ করে—যায় যাক আমার পাঁচ শ টাকা।

বিনোদ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, কত লোক যে আমার নাম করে দাদাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সে আমিও শুনেচি চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্তী গলা খাটো করিয়া কহিল, এই জয়লাল বাঁড়ুয্যেই কি কম টাকা মেরে নিয়েচে ছোটবাবু! ওই ব্যাটাই ত যত নষ্টের গোড়া। বলিয়া সে কর্তার মৃত্যুর পরে সেই ঠিকানা বাহির করিয়া দিবার গল্প করিল।

ভবানী কোন কথায় একটি কথাও কহেন নাই—শুধু তাঁর দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

চক্রবর্তী বিদায় লইলে বিনোদ শুইতে গেল; কিন্তু সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না। কেন এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিল, পিতা তাহাকে একভাবে বঞ্চিত করিয়া গেলেন, দাদা তাহাকে কিছুই দিতে চাহিতেছে না, চক্রবর্তীর মুখে আজ সেই ইতিহাস অবগত হইয়া সে ক্রমাগত ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

বিনোদের বন্ধুরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া রবিবারের সকালবেলা গোকুলের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোকুল দোকানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এতগুলি ভদ্রলোকের আকস্মিক অভ্যাগমে তটস্থ হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া ডেপুটিবাবুকে এবং সদরআলা গিরিশবাবুকে দেখিয়া তাঁহাদের যে কোথায় বসাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। বিনোদ নিঃশব্দে মলিনমুখে একধারে গিয়া বসিল। তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয় তাহাকে যেন বলি দিবার জন্যে ধরিয়া আনা হইয়াছে।

বাঁড়ুয্যেমশাই ছিলেন, কথাটা তিনিই পাড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে গোকুলের চোখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, ওঃ, তাই এত লোক! যান আপনারা নালিশ করুন গে, আমি এক সিকি-পয়সা ওই হতভাগা নচ্ছারকে দেব না। ও মদ খায়।

আর সকলে মৌন হইয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই ভঙ্গী করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বেশ, তাই যেন খায়, কিন্তু তুমি ওর হক্কের বিষয় আটকাবার কে? তুমি যে তোমার বাপের মরণকালে জোচ্চুরি করে উইল লিখে নাওনি তার প্রমাণ কি?

গোকুল আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চিৎকার করিয়া কহিল, জুচ্চুরি করেছি? আমি জোচ্চোর? কোন্ শালা বলে?

গিরিশবাবু প্রাচীন লোক। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, গোকুলবাবু অমন উতলা হবেন না, একটু শান্ত হয়ে জবাব দিন।

বাঁড়ুয্যেমশাই পুরানো দিনের অনেক কথাই নাকি জানিতেন, তাই চোখ ঘুরাইয়া কহিলেন, তা হলে আদালতে গিয়ে তোমার মাকে সাক্ষী দিতে হবে গোকুল।

তিনি যা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাই। গোকুল উন্মত্ত হইয়া উঠিল—কি, আমার মাকে দাঁড় করাবে আদালতে? সাক্ষীর কাঠগড়ায়? নি গে যা তোরা সব বিষয়-আশয়—নি গে যা—আমি চাইনে। আমি যাব না আদালতে; মাকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হবো।

নিমাই রায়ও উপস্থিত ছিলেন, চোখ টিপিয়া বলিলেন, আহা-হা, থাক না গোকুল। কর কি, কি-সব বলচ?

গোকুল সে কথা কানেও তুলিল না। সকলের সন্মুখে ডান-পা বাড়াইয়া দিয়া বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তেমনি চিৎকারে কহিল, আয় হতভাগা এদিকে আয়, এই পা বাড়িয়ে দিয়েচি—ছুঁয়ে বল—তোর দাদা জোচ্চোর | সমস্ত না এই দণ্ডে তোকে ছেড়ে দিই ত আমি বৈকুণ্ঠ মজুমদারের ছেলে নই।

নিমাই ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, আহা-হা, কর কি বাবাজী। করুক না ওরা নালিশ—বিচারে যা হয় তাই হবে—এ-সব দিব্যি-দিলেসা কেন? চল চল, বাড়ির ভেতরে চল। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

কিন্তু বিনোদ মাথা তুলিয়া চাহিল না, একটা কথার জবাবও দিল না—একভাবে নীরবে বসিয়া রহিল।

গোকুল সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, না, আমি এক-পা নড়ব না। উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাবা শুনচেন, তিনি মরবার সময় বলেছিলেন কিনা গোকুল, এই রইল তোমাদের দু'ভায়ের বিষয়। বিনোদ যখন ভাল হবে, তখন দিয়ো বাবা তার যা-কিছু পাওনা।

ওপর থেকে বাবা দেখচেন, সেই বিষয় আমি যক্ষের মত আগলে আছি। কবে ও ভাল হয়ে আমার ঘরে ফিরে আসবে—দিবারাত্রি ভগবানকে ডাকচি—

আর ও বলে আমি জোচ্চোর! আয়, এগিয়ে আয় হতভাগা, আমার পা ছুঁয়ে এদের সামনে বলে যা, তোর বড়ভাই চুরি করে তোর বিষয় নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধবেরা বিনোদকে চারিদিক হইতে ঠেলিতে লাগিলেন; কিন্তু সে উঠে না। বাঁড়ুয্যেমশাই খাড়া হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিলেন, বল না বিনোদ, পা ছুঁয়ে। ভয় কি তোমার? এমন সুযোগ আর পাবে কবে?

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, এমন সুযোগ আর পাব না। বলিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, তোমার পা ছুঁতে বলছিলে দাদা, এই ছুঁয়েচি। আমি মদ খাই—আর যাই খাই দাদা, তোমাকে চিনি। তোমার পা ছুঁয়ে তোমাকেই যদি জোচ্চোর বলি দাদা, ডান হাত আমার এইখানেই খসে পড়ে যাবে। সে আমি বলতে পারব না; কিন্তু আজ এই পা ছুঁয়েই দিব্যি করে বলচি, মদ আর আমি ছোঁব না। আশীর্বাদ কর দাদা, তোমার ছোটভাই বলে আজ থেকে যেন পরিচয় দিতে পারি। তোমার মান রেখে যেন তোমার পায়ের তলাতেই চিরকাল কাটাতে পারি। বলিয়া বিনোদ অগ্রজের সেই প্রসারিত পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।